প্রাক্তনী

Calcutta University Alumni Association
of Greater Washington DC
www.cuaa-dc.org
2015

TAALIM MUSICALS

CENTER OF LEARNING FOR
INDIAN CLASSICAL VOCAL MUSIC

Potomac & Germantown, MD

Academy of Indian Classical Music, an institute that guarantees a sound and rigorous training in classical and light vocal music promoting the art of music in our Culture and heritage

LESSONS OFFERED AT ALL LEVELS WEEKDAYS & WEEKENDS IN:

INDIAN CLASSICAL VOCAL, SEMI-CLASSICAL
BHAJAN, GHAZAL, BENGALI SONGS, HARMONIUM

Mitali0912@Yahoo.com

301-983-1379,
202-510-1726

PRAKTONI

প্রাক্তনী

2015

Annual Magazine

Volume 5

Calcutta University Alumni Association – Greater Washington DC

www.cuaa-dc.org

সম্পাদনা
লোকেশ ভট্টাচার্য
মহুয়া মুখোপাধ্যায়
দেবাঞ্জন বিশ্বাস

পরিচালক মন্ডলী
নিত্য নাথ - সভাপতি
মিতালী সাহা
বিমান পারিয়া
মহুয়া মুখোপাধ্যায়
দেবাঞ্জন বিশ্বাস

প্রচ্ছদ
দেবাঞ্জন বিশ্বাস
মহুয়া মুখোপাধ্যায়
পারমিতা সরকার

উপদেষ্টা পরিষদ
অপর্ণা প্রধান
বিধানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ধ্রুব চট্টরাজ
দিলীপ সোম
তারক ভড়

প্রকাশনা
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তনী সংঘ
বৃহত্তর ওয়াশিংটন ডি.সি.

নির্বাচন কর্মসমিতি
দেবকুমার চট্টোপাধ্যায়
রাধেশ্যাম দে
শঙ্কর বসু

সূচীপত্র

লেখক	শিরোনাম	বিষয়	পৃষ্ঠা
Nitya Nath	President's Corner		৫
নবকুমার বসু	বহে অনন্তধারা	প্রবন্ধ	৭
Aurora	Dream	Poem	১১
ভারতী মিত্র	কেয়ারটেকার	গল্প	১২
Prasun Kundu	Dark Matter and Dark Energy : The `Right Stuff' of our Universe	Essay	১৪
অজিনী চট্টোপাধ্যায়		ছবি	১৬
দেবাঞ্জন বিশ্বাস	নিত্যদিনের রবি	নিবন্ধ	১৭
সন্নিধি গুপ্ত		ছবি	১৯
Sreejato Chatterjee	Cars	Poem	২০
অজিনী চট্টোপাধ্যায়		ছবি	২২
Rohun Sarkar	When I overcame my fears	Essay	২৩
Ronoy Sarkar	An Ode to the Moon	Poem	২৩
সিংহমশাই	ছড়া		২৪
নীলমনি ভট্টাচার্য	শব্দ বিভ্রম	গল্প	২৫
Nitya Nath	What *Swadhinata* Meant to Me	Essay	২৬
সেঁজুতী	মিতালী সাহা	কবিতা	২৮
সব্যসাচী গুপ্ত	Scotland-এর Highland-এ	কবিতা (গান)	২৮
শ্যামল দাসগুপ্ত	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় - বি ই কলেজ, এক ভালোবাসার মহাকাব্য	স্মৃতিচারণ	২৯
অলকা চক্রবর্তী	সংখ্যাতত্ত্বের ইতিহাস ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান	প্রবন্ধ	৩১
লোকেশ ভট্টাচার্য	জীবন যেরকম	গল্প	৩৩

YOUR FRIEND,
YOUR NEIGHBORHOOD REALTOR

Nazir Ullah, the Realtor that
You Can Trust with Confidence!

LONG & FOSTER®
REAL ESTATE, INC.

longandfoster.com

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY REALTOR®

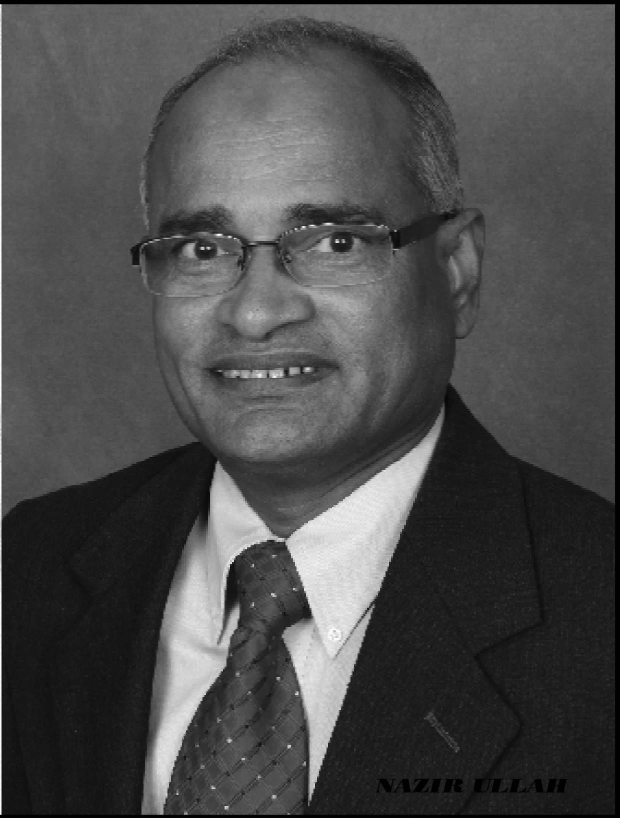

Nazir Ullah gets the results that you want
buying, selling or investing in real residential property

nazir.ullah@longandfoster.com
http://www.nazirullah.lnfre.com/

Top Producer,
Multi-million Dollar Producer,
Licensed in Maryland, Virginia, and DC
Notary Public

Your house, your dream
Your agent - Nazir Ullah
The name of your trust!

Nazir Ullah,
Long & Foster Realtors
12520 Prosperity Drive, Suite 105
Silver Spring, MD 20904, USA
Web site: http://www.nazirullah.lnfre.com/

301-388-2600 (Office)
301-388-2691 (Direct),
301-537-9885 (Cell)
Fax: 301-388-2601 (Office)
Email: nazir.ullah@longandfoster.com

President's Corner

It is an honor to me to present what we as an Alumni Association sought to do during the year and what we accomplished. My sole goal has been to promote the standard of our association if we can.

Traditionally, we have two annual functions: a summer picnic and a fall cultural function. The summer picnic was held in Black Hill Regional Park in Boyds, MD, in beautiful surroundings. We organized entertainment and fun for adults through music and games, and entertainment for children with a variety of games in which adults took part as well. The usual *adda* and fun that is part of a picnic was there in plenty. The food was very good. It was a very joyful afternoon and those who attended felt happy. The only drawback was poor attendance, which resulted from three social-cultural functions happening on the same day in the local Bengali community.

We have organized our annual cultural function on November 7 in Potomac Community Center, Potomac, MD, with an emphasis on quality of the various offerings. We are bringing in two accomplished professionals, Suchismita Mahanty for songs and Bratati Saha for Kathak dance, one of whom is a Calcutta University (CU) alumnus and the other an alumnus spouse. We will also have recitation by another alumnus, Swati (Piu) Sinha, to fill in the third arm of the Bengali culture. Our most ambitious offering this year is *Muktir Pathajatri*, a multi-media program on India's Struggle for Independence, presented by CU alumni and friends, and their family members. I extend my special thanks and appreciation to the artists of these programs for their hard work and dedication to our cause.

We publish the fifth issue of our annual magazine, *Praktoni*, this year. You will find exciting fictions, poems, drawings and scholastic articles by CU alumni and their families in the magazine. Of particular mention is the article by the renowned author Dr. Nabakumar Basu. As in previous years, the bulk of the sponsorship for the magazine came from the CU alumni, for which we are immensely thankful. I greatly appreciate the hard work and dedication of the members who made publication of this magazine possible. In coming years, we will seek to continue to improve the literary quality of this magazine.

We have evaluated possibilities of distributing the money (approx. $2,200) that we collected prior to 2012 for scholarship funds for CU students in Kolkata. It seems very forbidding to give this money for its indicated purpose, for various reasons including restriction of money transfer to a foreign country following the September 11, 2001 episode. If the CU alumni agree, we would like to distribute it to philanthropic organizations helping poor people in India.

Finally, I want to present here some of the challenges that I see in keeping our alumni association alive and vibrant. This is based on my experience over last 3 years, first as Secretary and then as President of this association.

The challenges are many: (1) Years back, a large part of the local Bengali community hailed from Calcutta University. That is no longer true. Moreover, there are many small cultural groups who are interested in working for their own organizations in preference to a bigger umbrella like the CUAA-DC. That thwarts our purpose. (2) Lately, during spring to fall, hardly any weekend goes by without several cultural and social gatherings, sometimes happening concurrently. How do we motivate the CU Alumni to come to our two annual events, picnic and cultural function? (3) The organization needs young committed people to work for its continuation. What is

problematic is that, in general, the young alumni are very busy establishing their careers and attending to the demands of their families with very young children. Without infusion of young blood, an organization cannot thrive. (4) I think the interest in keeping our alumni association alive as a general platform for sharing our cultural heritage, scholastic views and connecting with fellow alumni has waned considerably over the years. A serious question to answer: what is the purpose of the organization?

My personal opinion is that it is vital to keep the alumni association alive, for camaraderie among fellow alumni, and for promoting the legacy of our great institution and our roots for the sake of our children. But it will need real dedicated people to run the organization.

We are always exploring new ideas to shape our alumni association into a dynamic and functional association. It is extremely important that you, as CUAA-DC members and friends, enrich the association with your ideas and come forward to play an active role in the activities of CUAA-DC. Working together, we can ensure a bright future for our organization.

I thank all members of the current Executive Committee for working as a team to accomplish our goals.

Sincerely,

Nitya Nath
President
CUAA-DC Executive Committee

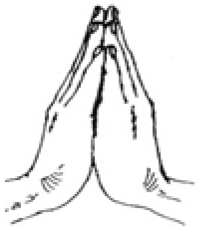

বহে অনন্তধারা

নবকুমার বসু

ঠাকুর তখন তাঁর জীবদ্দশা আর অলৌকীক দাম্পত্য জীবনের অনেকগুলো ঘাট পেরিয়ে এসেছেন। তাঁকে নিয়ে যে নানাবিধ উন্মাদনা, সমালোচনা, ইতি-বেতি আতিশয্যের টানাপোড়েন আর স্রোতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তের বঙ্গসমাজ ভাসছে, সে সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল এবং সচেতন। কিন্তু মানুষটি নিজের মনেই তখন এক অনিবার্য, নিবিড় প্রত্যয়ে স্বাক্ষরিত হয়েছেন। একটি নীরব এবং মন্থর ভাবান্দোলনের প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছেন রামকৃষ্ণদেব। অবচেতন মনে আগেই উপলব্ধি করেছিলেন, মানুষকে দেবতা বানিয়ে সম্ভবত দেবতারই অবমাননা করে মানুষ। অথচ আত্মোপলব্ধির আর একটি কড়া নাড়ার শব্দও যে মাথায় বাজছে!

বাজছে এক অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক চেতনার জগতে। কিন্তু তা বাজালো কে! সেটি জানতেই হবে।

বসে থাকতে-থাকতে নিজেই উত্তর পেয়ে যান। -ওই তো- -সে-ই। ও ছাড়া আর কেউ না। ও-ই আসল।

শান্ত - নিরীহ - শ্যামলা - শ্রীময়ী মুখটা চোখের ওপর ভাসে ঠাকুরের। মনে আসে, সেই অপূর্ব বিবাহের তেরটি বছর পূর্ণ হতে চলল। জয়রামবাটির মুখুজ্যে বাড়ির প্রায় ছ-বছরের কনে আর দামোদর নদ পেরিয়ে হুগলি জেলার সীমান্ত গ্রাম কামারপুকুরের চাটুজ্জে বাড়ির চব্বিশ বছরের বর। বয়সের অনেক তফাৎ, কিন্তু কিছু করার নেই। কোথায় যেন ঠিক করাই ছিল সব।

বিবাহটি কেন করতে গেলেন ঠাকুর! কী প্রয়োজন ছিল লৌকিক আয়োজনের মধ্যে দিয়ে ওই বালিকাবধূটিকে জীবনে নিয়ে আসার? তখন ভাবজগতে তোলপাড় চলছিল। তথাপি জেনেছিলেন, 'আপনি আচারি ধর্ম পরেরে শেখায়'। তিনি জানতেন, সনাতনমতের আশ্রম-মর্যাদা রক্ষায়, দার পরিগ্রহ, ঈশ্বর লাভের অন্তরায় হয় না। এবং দশবিধ সংস্কারসম্পন্ন না হলে মনুষ্যাচরণ এবং মনোবৃত্তি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় না। আর, পূর্ণতা লাভ না করলে, প্রকৃষ্টরূপে ধর্মপ্রবর্তক ও আচার্য হওয়া যায় না। যিনি আচার্য তিনিই নেতা; আর মানুষকে সর্ব বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করাই ধর্ম। যিনি করেন তিনিই ধার্মিক।

লৌকিক বিবাহের মধ্যে দিয়ে, সেখানেই কি তাহলে মানুষ রামকৃষ্ণ আর দেবতার মধ্যে তফাৎ হয়ে গেল! আসলে তা হয়নি। তিনি মনুষ্যদেবতা হিসাবে তখনই উপলব্ধির তীরভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, যখন টের পেয়েছিলেন এবং অষ্টাদশী যুবতী স্ত্রী সারদাকে আপন শক্তিস্বরূপিনী হিসাবে চিনতে পেরেছিলেন।

ব্যাপারটা খুব সহজ কর্ম ছিল না তো বটেই, সাধ্যাতীত বললেও অত্যুক্তি হয় না। কেননা শুধু নিজের চেনা তো না, বিবাহিতা স্ত্রী সারদা - যিনি তাঁরই গূঢ়তম আত্মিকসত্তার আধারশক্তি, তিনি কি আত্মসুখে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ! সেই জবাবটাও দরকার ছিল।

অনুভূতি এক জিনিস, স্বাক্ষরিত হওয়া আর এক ব্যাপার। তারজন্য নিভৃত আনুষ্ঠানিক আয়োজনেরও প্রয়োজন হয়। হ্যাঁ, নিভৃত এবং নিরাড়ম্বর যুগ্ম অনুষ্ঠান। যুগ্মের মধ্যেই দ্বিবিধ শক্তির লীলাবিলাস। দুই শক্তির মিলনেই প্রকৃত মহাশক্তি। কিন্তু সেই শক্তির অনুভবে মিলনের রকমফেরটি যাচাই করার দরকার আছে। তাই নিশ্চিত হয়েও আর একবার তাকিয়ে দেখতে চান ঠাকুর।

হ্যাঁ গো, তুমি কি আমায় সংসার পথে টেনে নিতে এসেছো?

কথাটা কানে গেল সারদার। এখন তিনি আর জয়রামবাটির সেট দুঃস্থ, পুরোহিত পরিবারের চঞ্চলা কিশোরী এবং ভাই বোনদের বড়দিদি নন। গ্রামবাংলার কাঁচা সোনার তাল, বহু তাপে-আগুনে-আঘাতে আজ দক্ষিনেশ্বরের মন্দিরের নহবতবাসিনী এবং পূর্ণ চিত্তেই পতি-অনুবর্তিনী এক নারী। লোকটাকে বুঝতে শিখেছেন দিনে দিনে। সেইসঙ্গে নিজেকেও।

নহবত-এর ছোট্ট কুঠরিতেই সারদার অধিকাংশ সময় কাটে। দেখাশুনা করতে হয় বৃদ্ধ শ্বাশুড়ি চন্দ্রমনিদেবীর। আবার ঝক্কি সামলাতে হয় ভক্ত শিষ্যশিষ্যাদের। লৌকিক জীবনে বউ মানুষের দায়দায়িত্ব তো কম না। আছে সামাজিকতা। আবার সীমাবদ্ধতাও। আছে শরীর। রাতে মন্দিরের ঘরে তাঁর কাছে গিয়েই থাকেন সারদা। স্বহস্তে প্রস্তুত খাবারদাবার নিয়ে যান তাঁর জন্য।

আসন পেতে, ঠাঁই করে দিয়ে, খাবার বেড়ে দিতে গিয়েই কথাটা কানে গেল। প্রশ্নটা কেন!

হাতের কাজ না-থামিয়েই বললেন, কেন তা করব?

মিটমিটে হাসি নিয়ে ঠাকুর বললেন, আমার বেশ যত্নআত্তি করছো, দেখভাল হচ্ছে . . . তাই ভাবলাম . . . ।

নিঃশঙ্কচিত্তে সারদা বললেন, ওসব তো করতেই হবে। কিন্তু . . . আমি তোমার ইষ্টপথে সাহায্য করতেই এসেছি।

অনেকটা জানাই ছিল ঠাকুরের। সারদার মুখের কথায় সেই জানাটাতেই আলো পড়ল। স্পষ্ট স্বীকারোক্তি। নিজেকে জানতে জানতেই তোমায় জানা। জিজ্ঞেস করলেন, সে পথ কেমন জানো কি?

সবটা আমি জানব কেমন করে? তবে ওপর ওপর দেখলে দুঃখকষ্টের বলেই মনে হবে।

তুমি তাইতে ভয় পাও নাকি গো?

ভাতের থালা এগিয়ে দিতে দিতে সারদা বললেন, তোমার ইষ্টকে যে অনুভবে পেয়েছে, তার আর ভয় কী!

খাওয়াদাওয়া শেষ হল। একটি প্রশ্ন থমকেছিল সারদার বুকের মধ্যে। ততদিনে বুঝে ফেলেছেন, শেষপর্যন্ত কর্তাটির যেন অজানা কিছুই না থাকে। মাথা নিচু অবস্থাতেই জিজ্ঞেস করে ফেললেন, আমাকে তোমার কি মনে হয়, বলবে?

উত্তর তৈরিই ছিল। মুখে পানের খিলিটি রেখেই বললেন, বলব বৈকি! তোমায় বলার জন্যই যে আমার ভাবনা। ওই . . . যে মা মন্দিরে আছেন . . . তিনিই এ-শরীরের জন্ম দিয়েছেন . . . এখন নহবতে বাস করছেন, আর . . . মুখে হাসির আলো ফুটিয়ে তুলতে তুলতে যোগ করলেন, আর সেই তিনিই এখন বসে বসে আমার সেবা করছেন। খাওয়াচ্ছেন। সারদা চমকালেন না, কাঁদলেন না। ওসব স্তর তিনি পেরিয়ে আসতে পেরেছেন। তথাপি মানুষটাকে বুঝতে পারার এই নতুন অনুভবে যেন আরও একবার শ্রদ্ধায়, দুরন্ত উচ্ছাসে বিদ্ধ হলেন। বললেন, হ্যাঁ গো, কী রূপ দ্যাখো আমার মধ্যে?

একেবারে চাঁছাছোলা স্পষ্ট উত্তর। - সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ। সত্য বলে মানি, তাই দেখতেও পাই। . . .

না, ব্যবহারিক বাস্তব জীবনযাপনের অনুভবে, বোধে, এসব কথোপকথনের সঠিক ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এসব তিনি আর তাঁর, দুজনের আন্তরিক নিবিড় আলাপচারিতা। গড়পড়তা মনুষ্য-জীবনবোধের অনেক উর্দ্ধের ব্যাপার। সে আকাশ আমরা ছুঁতে পারি না। প্রথম-প্রথম সারদামণিও ছুঁতে পারেন নি। পারার কথাও নয়।

সাড়ে পাঁচ বছরের ছুটকি বউ। কাকার কোলে চেপে এল শ্বশুরবাড়ি। শ্যামলা গয়ের রঙ, কিন্তু লাল চেলী পরা ঘুম ঘুম চোখেমুখে কী যে এক অপার্থিব স্নিগ্ধ রূপ দেখলেন শাশুড়ি, বরণ করতে গিয়ে নিশ্চল হয়ে তাকিয়েছিলেন। তারপর কুলো-বরণডালা বড়মেয়ে কাত্যায়নীর হাতে দিয়ে, কোলে টেনে নিলেন বউমাকে। - আয় মা, বুকে আয়।

দৃশ্যটি দূর থেকে দেখলেন তিনি। মায়ের কোলে আর এক ছোট্ট মা। স্থির নিশ্চিত হলেন। সিদ্ধান্তে কোনও সংশয় নেই। ভুল নেই। লাহা বাড়ি থেকে গয়না এনে বৌভাতের রাতে সাজানো হল নতুন বউকে। চন্দ্রমনির বুক ঢিপঢিপ করছে। বালিকা বধূ হলেও সে মেয়ে তো! আর্শির সামনে ঘুরে ঘুরে সে নিজের আভরণ দেখেছে, আর খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠছে। এবার পরের দিন কোন প্রাণে শাশুড়ি তার গা থেকে গয়না খুলে নেবেন!

মায়ের উৎকণ্ঠা, বেদনা তিনি টের পেয়েছেন। চন্দ্রমণিকে বললেন, তুমি অত ভাবছো কেন মা! ভোরবেলা যখন ঘুমুবে, আমি ওর গা থেকে এক এক করে গয়না খুলে দেব'খন। তুমি লাহাবাবুদের ফেরৎ দিয়ে এসো।

কিন্তু বাবা, ঘুম থেকে উঠে মা যে আমার কেঁদেকেটে একসা করবে!

করবে না, মা। তুমি শুধু ওকে বলবে, বর তোকে এর থেকে আরও অনেক ভাল ভাল গয়না গড়িয়ে দেবে।

খেলাচ্ছলে শুরু হয়ে গিয়েছিল লৌকিক-অলৌকিক, পার্থিব-অপার্থিব ধ্যানধারণার শিক্ষা। সোনার গহনা পরে বহিরাঙ্গের রূপলীলা নয়, তাঁর অর্ধাঙ্গিনীকে যে সাজতে হবে অন্তরের আর মনের আভরণে। সে সব তো এলেবেলে, আটপৌরে সাজ নয়। কালের নিরিখেই মহাকালের চোরাস্রোতের টানে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তাঁর উত্তরাধিকারিণীকে। সংসার-ধর্মের এই আপাত লৌকিক আবহের মধ্যে থাকতে থাকতেই ওকে গড়ে নিতে হবে। সংসারের মধ্যেই যে বিশ্বসংসারের অলৌকিক অনুভব আর স্পন্দন। . . .

তারপর দিন যায়। পরিবর্তন প্রকৃতির নিয়ম। বিশ্ব চরাচর জুড়ে সেই প্রকৃতি। কখনও ধূসর মেঘ, অনড় একগুঁয়ে হাতির পালের মতো আকাশ দখল করে দাঁড়িয়ে থাকে। থ্ম ধরা আকাশ চিরে যায় বিদ্যুতের ঝলকে, গম্ভীর গর্জনে মেঘ ডাকে, তারপর নামে ধারাবর্ষণ। পুকুর-নদী-নালা, খালবিল উপচে পড়ে। সীমাহীন প্রান্তর সেজে ওঠে সবুজে। একদিন ঠিকানা পালটায় মেঘ, রঙ বদলায়। সাদা পালতোলা নৌকো হয়ে সুদূর নীল আকাশে ভেসে যায়। কাশফুল মাথা দোলায়, শিউলি ঝরে। ঢাকের কাঠিতে বোল ওঠে। কোত্থেকে যেন হিমেল হাওয়া আসতে শুরু করে, শিশিরবিন্দু চিকচিকোয় ঘাসের ডগায়। গাছের পাতা রং বদলায় - হলুদ - বাদামি। দেখে মনে হয়, এ যেন ফুলের দ্বিতীয় ঋতু। আসলে এবার ঝরার পালা। উত্তুরে হাওয়া, কনকনানির জেরে পত্রহীন গাছগাছালি শীর্ণ, হাহাকারে দীর্ণ, কম্পমান। একসময় ঘুরতে শুরু করে হাওয়া। বিভ্রান্তিতে লুটোপুটি করে। কচি কিশলয়ের উদ্ভাস জাগে শীর্ণ শাখার ডগায়। তারপর দেখতে দেখতে পত্রপল্লবে, পুষ্পে উদ্ভাসিত হয়ে ধরিত্রীকে সাজিয়ে দেয় প্রকৃতি। বসন্ত সমাগমের ঢেউ ওঠে দখিনা বাতাসে। কত ভাবে উতল হয় মন, কিন্তু স্থায়ী হয় না। অগ্নিস্রাবী হয়ে ওঠে বাতাসের হল্কা। খর রোদের তাপে হলুদ হয়ে যেতে থাকে শস্যক্ষেত্র। ষড় ঋতু ঘুরে ঘুরে আসে আর যায়। আসা-যাওয়ার বিরামহীন দোলাচলে তিনি নিরন্তর দূর থেকে নজর রাখেন পাত্রীটির দিকে। সে নজর চোখের দেখায় নয়। মনের চোখে ভাবের দৃষ্টিতে; তাঁর অজানা থাকে না কিছুই। চোখের দৃষ্টিতে দেখা হয়, মনের দৃষ্টিতে হয় দর্শন। শোকতাপ-শ্রম, অভাব দারিদ্র্য, দূর্ভিক্ষে জেরবার সারদা, তিনি জানেন। আরও জানেন, গ্রাম্য কৌতুহল, সমালোচনা - তিরস্কার - অপমানে বাইরের লোক মুখের বিষাক্ত তিরে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে তার তরুণী নারীজন্ম। এমনকী ঘরেও তিষ্টোতে পারেন না সারদা। বাঁজা মেয়ে বলে উপহাস করে।

এরমধ্যে মাত্র কয়েকবারই দেখা হয়েছে দু'জনের। বালিকাবস্থা থেকে কৈশোরের আলোআঁধারির দিনগুলোয়, কখনও কামারপুকুর, কখনও জয়রামবাটিতে তিনি কাছে থেকেছেন। আর ভাবীকালের ভাবান্দোলনের বীজ বপন করে গেছেন পরম ঔদার্যে, নিবিড় সততায়। একইসঙ্গে উপলব্ধি করেছেন, চিরসঙ্গিনীটির নারীজন্মে ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা নেই।

যেমনভাবে অদৃশ্য থেকেও তিনি চালনা করেছেন, সারদা চলেছেন তেমনভাবে। উটকো লোকে তার বাইরের যুবতী-জীবনের অপূর্ণতা নিয়ে অনেক দুঃখ করেছে, এমনকী জন্মদায়িনী মা শ্যামাসুন্দরীও ভুল বুঝেছেন মেয়ে-জামাইকে . . . তো বাইরের লোক কোন ছার! ঘরসংসারে ওসব হয়।

সারদা লক্ষ করেন মানুষটিকে। দূরাগত নক্ষত্রের স্নিগ্ধ আলোর মতো কিছু একটা টের পান ইদানিং। আগে আগে মানুষটা তাঁকে খুঁটিনাটি কতকিছু ঘর গেরস্থালির কাজ শিখিয়েছেন। উনুন ধরানো, পলতে কাটা, রান্না করা, গরুর জাব্না দেওয়া . . . কিছুই বাদ যায় নি। তারপর ব্যাখ্যা করে করে শুনিয়েছেন রামায়ন-মহাভারত। ভগবত-গীতার ধারণা দিয়েছেন। কখনও ঘুমে ঢলে পড়েছেন সারদা। কবে থেকে যেন ঘুম ছুটে যেতে শুরু করেছিল। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখতে শিখেছিল - ওঁর মধ্যেই যেন অন্য কাউকে। সে কে! তারপরই হঠাৎ প্রশ্ন, ঈশ্বর কোথায় থাকেন গো?

তাঁর হাসি হাসি মুখটা প্রশান্তির দীপ্তিতে ভরে গেল। যা চেয়েছিলেন, ঠিক আছে। সারদা সঠিক সুরে বেজেছেন। বললেন, তিনি বাইরে কোথাও নেই।

আমি কি তাঁকে পাব?

পাবে। তুমি সুলক্ষণা, শ্রীময়ী। কিন্তু তাঁর কৃপাটুকু পেতে হবে।

কৃপা কী?

ক'রে পাওয়ার নামই কৃপা। নিজেকে অর্পণ করতে হবে।

তুমি কে?

তিনি হালকা গোঁফ-দাড়ির মধ্যে থেকে হাসলেন। - আমি আবার কে! তোমার স্বামী!

কথাটা যেন সম্পূর্ণ হল না। আর একটু কিছু বললে সারদার ভালো লাগতো। হঠাৎ তিনিই জিগ্যেস করলেন, তোমার কোনও দুঃখ আছে?

আছেই তো। সারদা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, ছেলেপুলে হল না এখনও, ফাঁকা ফাঁকা লাগে। মা-বলে কেউ ডাকে না, মনে লাগে।

লাগবে না। আর কিছুদিন যাক। এতো ছেলেপুলে হবে, যে মা-ডাকের চোটে অতীষ্ট হয়ে উঠবে। সবেরই সময় আছে গো!

কিছুদিন পরেই সারদা টের পেলেন, তাঁর ডাক হয়েছে। স্বামীর কাছে গিয়ে তাঁকে থাকতে হবে। উথাল পাথাল মনের অবস্থা। অতদূর কি গিয়ে পৌছাতে পারবেন! কখনও হেঁটে, কখনও রেলপথে, কখনও জলপথে সে যে তিন দিনের পথ!

শেষপর্যন্ত পাঁচদিন লেগে গেল। পথে ম্যালেরিয়া জ্বরের তাড়সে প্রাণ যায় যায়। কালো মতন কে এক মেয়ে স্বপ্নে এসে দেখা দিল। ভরসা দিয়ে বলল, যেতে তুমি পারবেই। যেতে তোমায় হবেই। তোমার যে অনেক কাজ বাছা!

আর তার কদিন পরেই সারদা টের পেলেন, তাঁর কথার নড়চড় হয় নি। সকাল থেকে সন্ধে মা-মা ডাক তাঁর সঙ্গে ফিরছে। কিন্তু শুধু তাই তো না! ঠারে ঠোরে আরও অনেক কিছু তিনি বলে যান তাঁকে। একদিন নিজে মুখে বললেন, মহামায়া দ্বার ছাড়লে তাঁর দর্শন হয়। মহামায়ার দয়া চাই। তাই শক্তির উপাসনা করতে হবে।

শক্তির উপাসনা মানে কী? মা-কালীর পূজো? সে তো মন্দিরে নিত্যই হচ্ছে। ঠাকুর নিজেই তার মূল পুরোহিত। ওদিকে আর এক পূজো চালিয়ে যাচ্ছেন অন্তরালবাসিনী সারদা। কখনও সেজোবাবু মথুরামোহন, কখনও শম্ভুবাবু রসদের জোগান দিয়ে যাচ্ছেন।

ঠাকুরের ভাব-শিষ্য ছেলেপুলে জুটছে কিছু। তারাও হাতে হাতে কাজ তুলে দিয়ে যায়। ভাগ্নে হৃদয়ও আছে - কখনও ঠাকুর মামার কাছে, কখনও এসে বসে মামীর কাছে। সকাল থেকে উনুন জ্বলছে, রান্না হচ্ছে। কাজের মধ্যে দিয়ে সে-ও তো পূজো-ই।

এই সবের মধ্যে আরও যেন কী একটা আয়োজনের নীরব প্রস্তুতি আর আবহ টের পান সারদা। ধীরে ধীরে তাঁর কাছে যাতায়াত করতে করতে বুঝে যাব।, ঠাকুর তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে জীবনচর্যার মধ্যে ফলিত করার জন্য পথ অন্বেষণ করছেন। তিনি বুঝেছেন, অদূর ভবিষ্যতে শান্তির স্পর্শ আর ধারাবাহিক প্রসন্ন লীলায় তিনি নিজেকে সমর্পণ করবেন মানুষের হাতে। কিন্তু কে চালনা করবে, কে প্রবাহিত করবে সেই লীলাতরঙ্গ!

এইবার চমক ভেঙ্গে গেল সারদার। তাঁর ইষ্টপথের সহায়িকা, একথা তো নিজমুখেই কবুল করেছেন তিনি।

অর্থাৎ ঠাকুর জানেন, নিত্য সম্বন্ধবশত তাঁর আর তাঁর ভক্ত সন্তানদের ত্রাণ আর পালনে আবহমানকাল ধরেই একজন 'সারদার' আগমন ঘটে ধরিত্রীর বুকে। তিনি তাঁর চেয়েও উন্নত এক আধার, তিনিই তাঁর শক্তি। সুতরাং তাঁকেই তিনি অভিষিক্ত করবেন মাতৃত্বে, দেবীত্বে।

কী এক উদাস আনন্দে, দায়িত্বে-প্রীতিতে-প্রেমে মুগ্ধ হয়ে গেলেন সারদা। ঠাকুর মানুষটার মনে মনে, তলে তলে তাহলে এই ছিল লৌকিক আচারের মধ্যে দিয়ে তাঁকে নিয়ে আসার। এই উপলব্ধিতে ভাসতে-ভাসতে, বর সেজে, টোপর মাথায় দিয়ে, কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটি এসেছিলেন সেই চৌদ্দ বছর আগের এক নিদাঘ বৈশাখে বিবাহ করতে!

ভক্তিতে-শ্রদ্ধায়-ভালবাসায় নিজের ভাবদৃষ্টি দিয়ে সারদা এবার দর্শন করলেন স্বামীকে। মনুষ্যরূপ ওঁর, আসলে অন্য কেউ।

জ্যৈষ্ঠ মাসের অমবস্যা তিথি। নিবিড় অন্ধকারে ডুবে রয়েছে চরাচর। সারাদিন খরতাপে দগ্ধ হওয়ার পরে এখন মৃদু বাতাসে শ্বাস নিচ্ছে প্রকৃতি। জোয়ার এসেছে পার্শ্বস্থ গঙ্গায়, কুলকুল শব্দে বহে চলেছে জলধারা। আজ ফলহারিণী কালীপূজার মহালগ্ন। আদ্যশক্তি মহাকালীরই ভিন্ন রূপ আর শক্তির প্রকাশ ফলহারিণীর মধ্যে। তিনি হরণ করবেন সব ফল, সব ঢেলে দিতে হবে তাঁর পদপথে। পূর্ণ নিষ্কাম কর্ম সমাধা করবেন ঠাকুর আজ। দেবী-মাতা-জায়া-কন্যা সব আজ একাকার ওই মানবী শক্তি সারদার মধ্যে। তাঁর পায়েই সব সমর্পণ করে আজ শুদ্ধ লীন হয়ে যাবেন ঠাকুর।

রাত নিশুত হয়েছে। কালো আকাশের বাগানে যুঁই ফুল তারার মেলা। দীনু আর হৃদে পুজোর আয়োজন সেরে বিদায় নিয়েছে। ঘরে মাত্র একটি প্রদীপ জ্বলছে। সুগন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। পাটভাঙ্গা ধুতি পরে, আদুড় গায়ে উপবীত ধারণ করে বসে আছেন ঠাকুর। কপালে চন্দনের ফোঁটা। শান্ত, সমাহিত ভাবের মধ্যেও অধরোষ্ঠে একটি তৃপ্ত হাসির আভাস জেগে রয়েছে।

স্নিগ্ধ সধবা দেবীর লালপাড় শুভ্র বসনে রোজকার মতই সারদা এলেন, যদিও জানেন এক অজানা লোকের রুদ্ধদ্বার আজ উন্মুক্ত হবে তার সামনে। স্মিত হাসি নিয়ে, পশ্চিমে গঙ্গার দিকে মুখ করে তাঁকে বেদীতে বসালেন ঠাকুর। পূবমুখো পুরোহিত তিনি, আসন গ্রহণ করলেন মাতৃরূপ দেবী মানবীর পদপ্রান্তে।

পূজা শুরু হল। প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারিত হল। একসময় পূজা সমাপ্তও হয়ে গেল।

আর ধরিত্রীর বুকে আধ্যাত্ম-চেতনা নতুন আকাশ স্পর্শ করল। মূর্তিমতী মানবীর দেহে সর্বশক্তির অধিশ্বরীর উপাসনা করে তাঁর জীবনভর সাধনার ফল সমর্পণ করলেন। তাঁর লৌকিক পুজোপাটের পরিসমাপ্তি ঘটালেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ, আর পূর্ণতার কানায় কানায় ভরে উঠল তাঁর মানবদেবত্ব।

কী পেলেন সারদা! ঠিক যেন ধরতে পারছিলেন না সেই মুহূর্তে। ধরা কি যায়! সেই আলো-আঁধারি ঘরের নিঃশব্দে, অর্ধ বাহ্যজ্ঞানশূণ্য, সমাহিত, অভিভূত, অকম্পিত স্থির নেত্রের দৃষ্টিতে শুধু ঝাপসা দেখেছিলেন, কী তীব্র গভীর অথচ অচঞ্চল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, শান্ত মানুষটা। যেন নিজে নয়, ওঁকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে আর কেউ। এটুকু মনে আছে। তারপরেই যেন তাঁর জন্মগত মাতৃহৃদয়কে মথিত করে কোন এক গভীর অনুভবের টান ভাসিয়ে নিয়ে গেল সীমাহীন সুদূরে।

মনে নেই আপন অস্তিত্ব আর চেতনায় উপনীত হয়েছিলেন কখন। কিন্তু হওয়ামাত্রই শুধু বুঝেছিলেন, মাতৃত্বের এক নতুন অনুভবে আর চেতনায় যেন আপনা আপনি ভরে উঠেছে হৃদয়। অভিভূত হয়ে উঠেছিলেন। শুধু মা-মা-মা শব্দের প্রতিধ্বনি আর অনুরণনে তিনি ভরে উঠেছেন, ধুয়ে যাচ্ছেন, পূর্ণ হয়ে উঠেছেন। এই আনন্দময় উপলব্ধি তাঁর আগে হয় নি। . .

এবার দিব্য রসেবশে রয়েছেন ঠাকুর।

ভাবখানা যেন, আমার যা করবার আমি তো করে দিয়েছি, এবার তুমি বোঝো, তোমার ঘর -সংসার - ছেলেমেয়ে - সব নিয়ে কী করবে! কিন্তু আসলে তা নয়। একমাত্র সারদাই জানেন। মানুষটা অনাসক্ত কিন্তু পলাতক নন। কাউকেই ঠাকুর ত্যাগ করেন নি। শুধু তাঁর অপরিমেয় অন্তরের ব্যাপ্তি আর সীমাহীন সহ্য এবং উদারতার কাছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যাবতীয় ক্ষুদ্রতা, পার্থিব চাওয়া পাওয়া। তাঁর আভিজাত্যের চটক নেই। প্রাচুর্যের অহংকার কোনকালে ছিল না। একমাত্র গৌরব সমর্পণ আর অসীম প্রীতিময়তা।

তাহলেও এতটা করার কী দরকার ছিল!

ছিল, সে কথাও তিনি জানতেন। তিনি ত্রিকালদর্শী। তাই ভাবের ঘরে চুরি ক'রে ঠাকুর সেজে বসে থাকেন নি। শরীর প্রাপ্ত যে! খাঁচাটি যে আর তেমন শক্ত পোক্ত থাকছে না, নেই, তা টের পাচ্ছিলেন। আধিব্যাধি, পেটের গোলমাল বারবার কাবু করে দিচ্ছে। তা তো দেবেই। শরীরের নিয়মই তাই। কিন্তু যে দায়িত্ব ঘাড়ে আপনি এসে পড়েছে, তা দিয়ে যাবেন কাকে!

আসলে সে সবই ঠিক করা ছিল। ধরাধামে কিছুকালের জীবনযাপন করার জন্য তিনি আসেন নি। তিনি ত্রাতা, তাই তাঁর আসার নাম অবতীর্ণ হওয়া। কিন্তু তিরোহিত হতে হবে, তাও জানা। সুতরাং ভার দিয়ে যেতে হবে তাঁরই কাছে, যাঁর উপলব্ধি আর শক্তির কাছে তিনি নিত্য বিরাজমান থাকবেন, তিনিই নিত্য বহমান রেখে যাবেন তাঁর নিরন্তর অনন্ত ধারাটি।

ইঙ্গিতময় কথাবার্তাও বলেন ঠাকুর। আর প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যটি টের পেয়ে যান সারদা।

নিজেকে দেখিয়ে ঠাকুর বলেন, এ আর কী করেছে! তোমায় আরও অনেক বেশি করতে হবে। তুমি মা যে!

হ্যাঁ, রক্ষা-ধারণ-পালন মূলত মা-এরই কাজ যে! মা-ই শক্তি। শক্তি বিনা জগৎ অচল। আবার তিনিও যে নেই তা নয়। সৃষ্টির উদারতা আর তন্ময়তায় প্রীতিস্নিগ্ধ চিরবিরাজমান তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণ।

তবু একদিন মহাসমাধিতে নিমগ্ন হলেন মা-এর প্রাণের ঠাকুর। শ্রাবণ পূর্ণিমার রাত। জলভরা মেঘ থমকে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎই যেন কিছুক্ষণের জন্য মেঘের ফাটল চিরে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত হয়ে উঠল চরাচর। আবার আস্তে আস্তে ঢেকে গেল। ঠাকুর জাগলেন না।

মুষলধারায় বৃষ্টি এসে ভাসিয়ে দিল শহর গঞ্জ। পাথর হয়ে বসে রইলেন মা।

তারপর রাত শেষ হল। মেঘভাঙা আকাশের পূব দিক থেকে দৃশ্যমান হলেন সূর্যদেব। দাহকার্য সমাপ্ত হ'তে হ'তে বিকেল গড়িয়ে গেল। গঙ্গার ভাঁটার জলে তিরতিরে স্রোত। বৈরাগ্যের অনুভব সত্বেও মা দেখলেন, মেঘের সীমান্তে লেগে রয়েছে গোধূলির কমলা রং। ঘরে ফেরা পাখির ঝাঁক ডানা মেলেছে আকাশে। আর জীবনের এই ছড়ানো উদ্ভাসে মিশে রয়েছেন তিনি স্বয়ং। বহে চলেছেন অনন্ত আনন্দধারা হয়ে।

---

*প্রথিতযশা প্রবাসী (ইংল্যান্ড) সাহিত্যিক ডঃ নবকুমার বসুকে এই বছর টেকনো ইন্ডিয়া, আজকাল ও এন.এ.বি.সি-র যৌথ উদ্যোগে দেওয়া বর্ষশ্রেষ্ঠ বাঙালী সাহিত্যিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এই লেখাটি প্রাক্তনীতে ছাপানোর জন্য দিয়ে আমাদের তিনি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

Dream

Aurora

A dream…
Dreams don't come true
If they did I'd be happy
My life would be
Everything I want…
…And more…
Why do people say that
Dreams come true,
When they don't?
And we all know that.
Who can tell?
Maybe it's just something
To enhance our imagination
Even if it means
The drop back down to reality
Is going to hurt
More than ever.
It's like playing
A dangerous game
That you love
And is addictive and harmful
Like a drug.
A dream
Is a dream though
Like a rose
Is a rose
Or is it?

কেয়ারটেকার

ভারতী মিত্র

আজ আবার ফোনটা এল। ধরবে না, ধরবে না, করেও সাতপাঁচ ভেবে ধরেই ফেলল ফোনটা শিবু . . . ওরফে ব্রেন সার্জন ডক্টর শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, এম-ডি পি-এইচ-ডি। তার এই ডাকনামটা এদেশে, এই লুইভিল কেন্টাকীতে, একমাত্র স্ত্রী নীলিমা ছাড়া কেউ জানে না। কিন্তু স্ত্রীরা, বিশেষ করে তাদের যুগের স্ত্রীরা, ত আর স্বামীর নাম ধরে ডাকে না। নীলিমা হয় বলে 'ওগো' নয়ত বলে 'ডাক্তার', তাই শিবু নিজেই নিজেকে ওই নামে ডাকে মাঝে মাঝে, বিশেষ করে যখন নিজের বোকামোর জন্য নিজেকে চাবকাতে ইচ্ছে করে, সেই সব দুর্লভ মুহূর্তে।

এটিও তেমনি একটি মুহূর্ত।

দেশের বিশাল পৈতৃক বাড়ী প্রমোট করিয়ে অনেক শখে মাল্টিস্টোরীড লাক্সারী কন্ডোমিনিয়াম তৈরী করিয়েছিল শিবু আর নীলিমা, তাও বেশ ক'বছর হয়ে গেল . . . সেটির সবচাইতে বড়ো ও লাক্সুরিয়াস কন্ডোটি বলাই বাহুল্য নিজেদের ব্যবহারের জন্য রেখেছিল। প্রমোটাররাই অন্য লেভেলগুলো বিক্রি করে দিতে সাহায্য করেছে। এবারে নিজের পরিবারের মধ্যে থেকে 'আপনজন' একটি অবিবাহিত মাসতুত ভাইকে পছন্দ করেছিল শিবু। তাকে বাড়ির সমস্ত রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। মাসে মাসে সাত হাজার টাকা পাঠাতে হত, যার বিনিময়ে কথা ছিল ভাইটি সপ্তাহে একটিবার এসে বাড়ি খুলে ঝিকে দিয়ে পরিষ্কার করাবে। দরজা-জানালা ঘন্টাকয়েকের জন্য খুলে দেবে, যাতে ভ্যাপসা গন্ধ হয়ে না যায়। এ'ছাড়া আর বিশেষ কোনো দায়িত্ব ছিল না।

বাবু, অর্থাৎ শিবুর এই ভাইটি, থাকে তার অবিবাহিত দিদি ও বেকার বিবাহিত একটি ভাই আর তার পরিবাবের সঙ্গে, দু'টি ঘর ও লাগোয়া একটি ছোট্ট রান্নাঘর ও বাথরুম ভাড়া নিয়ে। বাবুর নিজের ঘর নেই। মেজানাইনে ছোট্ট একটি ভাঁড়ার ঘরে তার বিছানা, মাথা নিচু করে ঢুকতে হয়। তাই শিবু ভেবেছিল, মাসিক এই সাত হাজার টাকার ভাতায় ওদের হয়ত কিছুটা সাহায্য হবে।

কাজের চাপে শিবুর আর দেশে যাওয়া হয় না, তাই ফোনে খবরাখবর নিয়েই নিশ্চিন্ত ছিল এতদিন। কিন্তু পাড়ার এক ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের কাছে ক্যালিফোর্নিয়ায় এসে শিবুকে ফোন করেন। একথা ওকথার পরে বাড়ির কথা উঠে পড়ে, আর তখনই সব কথা প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

জানা যায় যে ভাইটি রোজই আসে, আসে না বলে বলা ভালো, সে শিবুর কন্ডোটিকে প্রায় নিজের করে নিয়েছে। সারাদিন থাকে, রাত্রেও থাকে, বাথরুম, বিছানা, রান্নাঘর সবই ব্যবহার করে, সন্ধ্যেবেলা বন্ধুবান্ধব নিয়ে তাসের ও মদের আড্ডা বসায়। কোনও কোনও দিন দু'চারজন মহিলাকেও নাকি দেখা গেছে ও বাড়িতে।

শিবুর মনে পড়ে, তার বাবার আমলের এক বৃদ্ধ উকীল একবার বলেছিলেন, তাকেই বাড়ির দায়িত্ব দেবে তোমার বাড়িতে যার দরকার নেই। কথাটা তখন বুঝেছিল শিবু, কিন্তু প্রয়োজনে সে উপদেশ কাজে লাগাতে পারল না কেন? বাবুর উপর করুণা? স্নেহ? দুর্বলতা?

যাই হোক, প্রথমটায় বিশ্বাস হতে চায় নি। বাবু বহুদিন ধরেই শিবুর অনুগত, কথা শুনে চলেছে বরাবর। শিবুর বাবা-মা যখনি অসুস্থ হয়েছেন, ডাক্তার-বদ্যি, এমনকি হাসপাতাল ছোটাছুটিও করেছে বাবুই। মানুষের কি সত্যিই এতটা পরিবর্তন হয়? হওয়া সম্ভব? কিন্তু দেশের কিছু কিছু নিকট-আত্মীয়দের কাছ থেকেও যখন এই ধরণের একটা আভাস সে পেল, যে বাবু এখন পার্টির মাতব্বর মানুষজনের ডানহাত হয়ে পড়েছে, তখন কি করবে ভেবে কিছুদিন বেশ দিশেহারা লেগেছে। তারপর মনস্থির করে ফেলেছে, ও বাড়ি আর রাখা যাবে না, বিক্রি করে দেওয়াই ভালো। আপদ চুকে যাবে। তারপর আবার কখনও দেশে গেলে তখন একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে নিলেই হবে।

এখন, কার উপর নির্ভর করা যায়? ভেবেচিন্তে এমন এক বন্ধুকে ফোন করল যে নিজে কলকাতার একজন অফিসিয়াল প্রপার্টি ইভ্যালুয়েটর। সে রাজি হল বাড়িটি বিক্রীর দায়িত্ব নিতে।

শিবুর ফ্ল্যাটটি বেশ বড়, তায় গড়িয়াহাট মার্কেট থেকে হাঁটা পথ। কয়েক বছর আগে নীলিমা গিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বীল্ট-ইন ক্যাবিনেটস্ তৈরী করিয়ে ও প্রায় লাখখানেক টাকা দিয়ে ফার্নিশ করিয়ে রেখে এসেছিল।তাই শিবুর দৃঢ় ধারণা ছিল যে বাজারে এ বাড়ি পড়তে পাবে না। কিন্তু কার্যত দেখা গেল যে বাড়িটি পড়েই আছে . . . মাঝে মাঝে দু'একজন এসে দেখে যায় বটে, কিন্তু কেনবার নাম কেউ করে না।

বাড়ি বিক্রি হবে শুনে বাবু প্রথমেই বলল, আরে দাদা, তোমার বন্ধুকে আবার এ ব্যাপারে বিরক্ত করলে কেন?

আমাকে বললে বাড়িটা ত আমিই বিক্রি করে দিতে পারতাম। আমার কত পরিচিত লোক আছে জান? যাই হোক, বাড়িটা বিক্রি হলে কিন্তু আমাকে থোক পনের লাখ টাকা দিতে হবে, বলে দিলাম, হুঁ!

কেন রে?

দেখো এ বাড়ির ক্রেতা আমিই জোগাড় করে দেব। তোমাকে ভাবতে হবে না।

সেই শুরু। তারপর থেকে প্রতি সপ্তাহেই ফোন আসে, আজ বলে দাদা, আমার টাকা বাড়িয়ে দাও। ওই সাত হাজারে কী হয়? জুতো পরে সব বাইরের লোকজন বাড়ির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যায়, প্রায় প্রতিদিন ঘর মুছতে হয়। কাজের মেয়েটা ওই অল্প টাকায় করতে চায় না। আমার নিজের টাকা থেকে আর কত দেব? আমিই বা খাব কী তাহলে?

কাল বলে, দাদা, পাড়ার ছেলেরাপুজোর চাঁদা চায়, না দিলে কিন্তু লোকজন বাড়ি দেখতে এলে ভাংচি দেবে। ওদেরকে খুশী রাখতেই হবে। এ মাসে তাই হাজার দু'য়েক টাকা এক্সট্রা পাঠিও ত।

পরে আর একদিন বলে, বন্ধুর মেয়ের বিয়ে, যৌতুক দেবার টাকা নেই। হাজার দেড়েক টাকা পাঠাতে পারবে?

শিবু এই ফোনের জ্বালার ব্যতিব্যস্ত। আজকাল ফোন এলেই ভয় হয়, বাবুর ফোন নয়ত? নিজের আত্মীয়, তাকে দূর দূর করে কুকুরের মতন তাড়িয়ে দিতেও মন চায় না। তাছাড়া যে ভাবে কায়েম হয়ে বসেছে, মনে হয় তাড়াতে হলে থানা-পুলিশ করতে হবে, এবং তাতেও হবে কিনা সন্দেহ। বাবুর পার্টির দাদাটি হয়ত তাদেরও ঘুষ খাইয়ে রেখে দেবে।

বাড়িটা কি তাহলে একেবারেই হাত ছাড়া হয়ে গেল? একেক দিন রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠে শিবু। দেশে যেতেও ভয় হয়। গিয়ে ত ওই বাড়িতেই উঠতে হবে, রাতে সেখানে থাকতেও হবে। বাবুর কাছে চাবি। আনন্দবাজারে খবর হয়ে বেরোবে না ত তারা? প্রৌঢ় এন-আর আই দম্পতীকে নিজের ফ্ল্যাটে খুন . . .

এখন এই মুহূর্তে তাদের খুন করে বাবুর কোনও ফায়দা অবশ্যই নেই, বরং অসুবিধে। কিন্তু বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে মরীয়া হয়ে কী করে বলা কি যায়?

ফোন ধরা তাই আজকাল একরকম ছেড়েই দিয়েছে শিবু, বিশেষ করে যদি সে ফোন দেশ থেকে আসে, কিন্তু আজ কী মনে করে ধরেই ফেলল। আর তখনই নিজেকে চাবকাতে ইচ্ছে করল, ''করলি কি শিবু, আবার সেই লক্ষ্মীছাড়াটার ফোন ধরলি? এখুনি আবার টাকার জন্য তাগাদা দেবে।''

ফোনের অপর পারে একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত গলা শোনা গেল, ''আপনি কি ডাক্তার শিবশংকর চট্টোপাধ্যায়?''

''কে বলছেন?''

''আমি কলকাতার বালিগঞ্জ থানার ও সি, অমর লাহিড়ী বলছি।''

''থানার ও সি? কী হয়েছে?''

''আপনার কি কলকাতায় তেরো বাই পাঁচ কাঁকুলিয়া বাই লেনে একটা ফ্ল্যাট বাড়ি আছে?''

''হ্যাঁ স্যার। কেন বলুন ত?''

''ওখানে কি শুভায়ু গাঙ্গুলী নামে একজন থাকতেন?''

''থাকতেন . . . মানে থাকেন কিনা ঠিক জানি না, কারণ থাকতে স্যার কখনই দিই নি . . .তত্ত্বাবধান করবার জন্য চাবি দেওয়া ছিল, এখন থাকতে শুরু করেছে, এই রকমই শুনেছি। কেন কী করেছে সে?''

''খুন, মানে ওই শুভায়ু-বাবু গতকাল রাতে আপনার ফ্ল্যাটে খুন হয়েছেন।''

''সে কী!''

''হ্যাঁ, খুনের তদন্ত হবে, তাই আপনাকে ত দাদা একবার কলকাতায় আসতে হবে।''

Dark Matter and Dark Energy: The 'Right Stuff' of our Universe

Prasun Kundu

"Gorgeous indeed is thy bracelet
Studded with countless stars
Like sparkling jewels to cherish and to covet
In myriad dazzling colors."

Thus begins a Tagore song familiar to many Bengali-speakers. It was a familiar nocturnal sight for the ancients but is becoming increasingly rare in modern times. But if one cares to move away from the city lights and looks up at the sky on a clear night, one is still greeted by this majestic sight. One cannot but be awestruck by the gleaming band of starlight that extends across a large part of the night sky. Called the 'Milky Way', it has intrigued amateur sky-watchers and professional astronomers alike for centuries. But what is it? The mystery cleared up only in the twentieth century. It was revealed that the Milky Way is a giant star-system to which our solar system belongs. This star-system, called a galaxy (gala means milk in Greek), is shaped like a disc with spiral arms coiling around a central bulge and spinning like a pinwheel. The sun lives in one of those spiral arms about half way from the center. Looking further out into the sky we find that there are numerous other majestic spiral galaxies shaped just like our Milky Way. Why do we not see the spiral arms of our galaxy? It is just a matter of perspective, very much like trying to guess the shape of a house looking from within. We live within the disc and therefore can only get an edge-on view of it, which is just the band we see in the sky.

The analogy with a pinwheel is a fairly close one. The stars indeed go around the galactic center. For example, our sun takes about 240 million years to orbit the center of the Milky Way. However, the rotation is not quite like that of a rigid disc since the angular speeds of the stars are not all the same. Rather the galactic disc is more like the solar system with the planets going around the central object, namely the sun, at speeds that depend on how far the planet is from the sun. The planets are held in orbit by the force of gravitation and their motion is described by the three Kepler's Laws that in turn follow from Newton's inverse-square law. A similar situation is expected for stars within galaxies as well. The main difference is that unlike the solar system, the total matter of the galaxy is not concentrated at the center but distributed throughout the entire galaxy in the form of stars, gas and dust. Astronomers were in for a big surprise when they tried to reconcile the measured speeds of stars in a galaxy with the matter distribution that is supposed to cause this motion. Researches carried out by astronomer Vera Rubin in the 1970's showed that the stars near the periphery of a galaxy move much faster than they should, based on the amount of visible matter. In other words there appears to be a lot more matter at the outskirts of a galaxy than can be accounted for by the usual stars, gas and dust that we can actually see. Thus arose the idea that the galaxies possess giant halos of some yet unknown form of matter, known as 'Dark Matter', which interacts with 'normal matter' that we are familiar with, only through the force of gravitation. Presence

of dark matter is generally indirectly inferred by its dynamical influence on visible matter and through its gravitational lensing effect on the light from more distant objects passing through it. The Milky Way is estimated to have about 10 times as much dark matter as normal matter. In 2005, astronomers from Cardiff University even claimed to discover a galaxy that does not contain any visible star and is almost entirely made out of dark matter. The most direct evidence for dark matter comes from a system called the Bullet Cluster. In most regions of the universe normal and dark matter are found together bound by mutual gravity. In the Bullet Cluster the two components appear to have clearly separated in the aftermath of a collision between two galaxy clusters. A clear physical understanding of dark matter remains elusive.

There has been even more surprise in store in recent years. It has long been known that the universe originated from a presumably infinitely hot dense singular state some 13.8 billion years ago and has been expanding ever since. Many predictions of this 'Big-Bang' Model formulated by Belgian astronomer Georges Lemaitre in the 1930's have been confirmed by observation. Russian mathematician Alexander Friedmann originally theoretically predicted an expanding universe from Einstein's general relativity theory. This was confirmed in 1929 by Edwin Hubble, who found that the galaxies are receding from one another and moreover, the further away a galaxy is the faster it is receding. This can be understood in terms of a stretching of the space between the galaxies caused by a general cosmic expansion. For many years it was believed that Friedmann's mathematical model accurately described the expansion of the universe. According to this picture, the expansion that started in an explosive manner should gradually slow down due to mutual gravitational attraction of matter. This indeed seems to be the case in the initial stages of the history of the universe. But it has been discovered in 1998 by Saul Perlmutter, Brian Schmidt, Adam Riess and others that this expansion started to speed up after about 8 billion years. An unknown form of energy, called 'Dark Energy', has been invoked to explain this bizarre effect. In its simplest form it is hypothesized as a uniform energy density filling all of space, which exerts negative pressure leading to an accelerated expansion. In fact it is nothing but a reincarnation of the so-called cosmological constant that Einstein introduced earlier in 1917 to construct a static model of the universe model from his general relativity theory and later discarded as 'the biggest blunder of my life' when the expansion of the universe was discovered and Friedmann's model seemed to explain it quite well.

How did this remarkable finding come about? A basic problem that one faces in cosmology is to figure out the distance of a celestial object. A dimmer nearby galaxy in the foreground can be easily mistaken for a brighter galaxy that is further away. Therefore one speaks of 'standard candles' to calibrate distance. Astronomers have built up an elaborate 'Cosmic Distance Ladder' by stitching together various methods to compare similar objects at different distances. A particular 'rung' of this ladder that measures the distance of a galaxy is a relatively new method based on the detection of a so-called Type Ia supernova explosion in that galaxy. These occur when a white dwarf star pulls in enough matter from a companion nearby to go over the Chandrasekhar limit of 1.4 solar mass and reignite a runaway nuclear reaction that ends in the star blowing itself up. The mechanism behind this phenomenon is thought to be universal and therefore it serves as a standard candle. It is the recalibration of cosmic distances based on this phenomenon that led to the discovery of the accelerating cosmic expansion. It is easily the biggest

astronomical discovery of our time just as the Hubble expansion of the universe was for a previous generation. The currently prevailing view has incorporated the concepts of both dark matter and dark energy as essential components of a comprehensive explanation of the formation and evolution of the large-scale structures in the universe. The latest results from the Planck satellite mission puts the content of the universe at roughly 68% dark energy, 27% dark matter and only 5% ordinary matter that is made out of atoms known today.

We have come a long way since Man placed himself at the center of the universe. It has been a humbling climb-down from that lofty perch. We have already known that we live on a small planet orbiting a very ordinary star that resides in a galaxy along with billions of other stars. This galaxy is just an island travelling through the vast emptiness of space along with billions of others like it. And now we learn that we are not even made from the 'right stuff' that makes up the bulk of this universe!

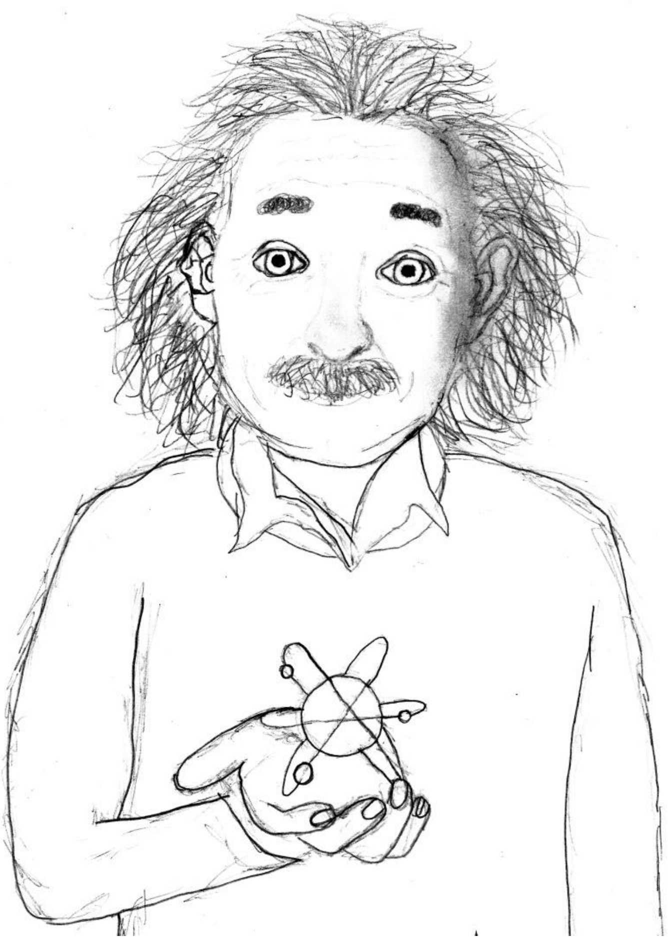

Abjini Chattopadhyay, Age: 9

নিত্যদিনের রবি

দেবাঞ্জন বিশ্বাস

বাঙালি জীবনে রবীন্দ্রনাথ নামে প্রতিষ্ঠানটির অভিঘাত অনেকটা বাঁধভাঙা প্লাবনের ঢেউয়ের মতো। প্লাবন থেমে যাওয়ার বেশ কিছুদিন পর পর্যন্ত যেমন বহু দূরের কূলে-উপকূলে ঢেউ আছড়ে পড়তে থাকে, সেইরকমই রবি ঠাকুরের অস্ত যাওয়ার সত্তর বছর পরেও রবি-প্লাবনের ঢেউ এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে আমাদের বাঙালি জীবনের সকাল সন্ধে। রবীন্দ্রনাথের গান কবিতা আজও আমাদের সাথি, শীতলা পূজোর ভাসান থেকে শুরু করে ব্যস্ত দিনের শেষের ক্লান্ত রাত পর্যন্ত, যখন বিছানায় গা এলিয়ে দেবার আগে প্রিয় শিল্পীর গলায় তাঁর গান পাশবালিশের মতোই অত্যাবশ্যকীয় মনে হয়। রবীন্দ্রসাহিত্যের সাথে যতই আমার পরিচয় ধীরে ধীরে বেড়েছে, ততোই আমার বিস্মিত মনের আড়ালে একটা প্রশ্ন বড় বেশী করে উঁকি মেরেছে - রোজকার জীবনে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ মানুষটি কেমন ছিলেন? সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষাবিদ, বা প্রশাসক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্মকান্ডকে যে উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন, তার সঙ্গে বেশি বা কম আমরা প্রায় সকলেই পরিচিত। কিন্তু এই অসাধারণত্বের আড়ালে কি এমন কোনও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যিনি দৈনন্দিন জীবনে তুলনামূলক ভাবে হলেও ছিলেন সামান্য আটপৌরে, কিছুটা আমাদেরই মতো? তাঁর সান্নিধ্য-ধন্য বহু লোকের লেখায়, স্মৃতিচারণে মূলত যে ছবিটি ফুটে ওঠে, তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনে হয় যে তিনি ছিলেন এমন এক অতিমানবীয় চরিত্র যিনি রোজকার জীবনের চালচিত্রে প্রায় কোনভাবেই আঁটেন না, চারপাশের মানুষগুলো থেকে তিনি এতটাই আলাদা। আর তাই, নোবেল প্রাইজ পাওয়ার মতো সংবাদেও উচ্ছ্বাস চেপে রেখে প্রাথমিক অভিব্যক্তিতে তিনি বলতে পারেন যে শ্রীনিকেতনের কাঁচা নর্দমা পাকা করার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থের সঙ্কট এবার দূর হবে, আবার অন্য দিকে প্রিয়তম সন্তান শমীন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুতেও তিনি বহিরঙ্গে অবিচলিত থাকেন। এক ফোঁটা চোখের জল না ফেলে, নিজের বুক ভাঙ্গা বেদনা প্রকাশ করতে পারেন মর্মস্পর্শী এক কবিতায়। কিন্তু এই larger-than-life চরিত্রের পিছনে কি এমন কোনও নিত্যদিনের রবি ছিলেন যিনি আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতোই কখনও সামান্য ঘটনায় রেগে যেতেন, আবার হয়ত বিনা কারণেই খুশি হয়ে উঠতেন? তবে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা আমার মত লোকের পক্ষে অন্ধের হাতি দেখার থেকেও কঠিন কাজ। কিন্তু তা সত্বেও এই ভূমিকাটি আমার শোনা একটি ঘটনার কথা বলার জন্যে বেশ প্রাসঙ্গিক।

গল্পটা আমি শুনি আজ থেকে বহুদিন আগে, আমার বাবার মুখে। তখন ষাটের দশকের অন্তিম লগ্ন। বাবা রসায়নের নবীন অধ্যাপক হিসাবে যোগ দিয়েছে কলকাতার এক কলেজে। সেইখানেই তাঁর সাথে পরিচয় হয় শ্রী প্রমথনাথ বিশীর, যিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত কাছের মানুষ। নানান কাজের প্রয়োজনে প্রমথনাথ তখন প্রায়ই আসতেন সেই কলেজে, সহজে মিশতেন বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষকদের সাথে। রবীন্দ্রনাথের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের সুবাদে তখনকার শান্তিনিকেতন ও গুরুদেবকে নিয়ে তাঁর গল্পের ভাণ্ডারটি ছিল অফুরন্ত। একদিন আলাপচারিতার ফাঁকে বাবা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা, আপনি রবীন্দ্রনাথকে কখনও রাগতে দেখেছেন?" প্রৌঢ় মানুষটি সরস হেসে শুনিয়েছিলেন এমন একটি গল্প যেটাকে অসামান্য বললেও কম বলা হয়।

তখন কিশোর প্রমথনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের ছাত্র। স্বভাব গুণে আর তীক্ষ্ণ মেধায় তিনি শান্তিনিকেতনে আসার কিছুদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত স্নেহভাজন

হয়ে উঠেছেন। গুরুদেব তাঁর বাঙলা লেখার হাতটিরও তারিফ করেন মুক্তকণ্ঠে। রবীন্দ্রনাথের একটি অভ্যাস ছিল যে তিনি লিখিত খসড়া পান্ডুলিপির কিছু অংশ প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের পড়তে দিতেন আর বলতেন যে লেখাটি পড়ে সেটি কেমন হয়েছে সে বিষয়ে মতামত একটি খাতায় লিখে তাঁর কাছে জমা দিতে। তারপরে সেই সাহিত্য সমালোচনা নিয়ে গুরু শিষ্যের মধ্যে হত মতের আদানপ্রদান। রবীন্দ্রনাথ সেই সময় সম্ভবত তাঁর কোন একটি উপন্যাস লিখছিলেন। তিনি প্রমথনাথকে সেই উপন্যাসের দুটি পরিচ্ছদ পড়তে দিলেন, আর বলে দিলেন যে রচনাটি কেমন লাগল তা পরিস্কার ভাবে লিখে জানাতে। রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখাতে, বিশেষত তাঁর গদ্যে, অনেক জায়গাতে সচেতনভাবেই সাধু আর চলিত ক্রিয়াপদের মিশ্রন ঘটাতেন। আবার কখনও কখনও তিনি একই বক্তব্য একাধিকবার ব্যক্ত করতেন বিভিন্ন ভঙ্গিতে, আলাদা আলাদা ব্যঞ্জনার সঙ্গে। এগুলো ছিল তাঁর রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য। যে পান্ডুলিপিটা তিনি কিশোর প্রমথনাথকে পড়তে দিয়েছিলেন, স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যেও এই বৈশিষ্টগুলো উপস্থিত ছিল। অল্প বয়সের চপলতায় কিশোর প্রমথনাথ লেখাটির খুবই কড়া সমালোচনা করলেন। বহু জায়গায় তিনি লিখে দিলেন "এইখানে গুরুচন্ডালী দোষ হইয়াছে", "এইখানটা বহুত্বদোষে দূষিত", "এইখানে অর্থ প্রাঞ্জল হয় নাই", ইত্যাদি নানা ধরণের মন্তব্য। সামালোচনাটি রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হয়েছিল কিনা জানা নেই, কিন্তু তিনি এই নিয়ে প্রমথনাথের সাথে কোন আলাপচারিতা সম্ভবত করেন নি। তারপরে কেটে গেছে কয়েক মাস, সামনেই বসন্তোৎসব। সেই অনুষ্ঠানে প্রমথনাথ নিজের লেখা একটি রচনা পাঠ করবেন। লেখাটি কেমন হয়েছে একবার দেখে দেওয়ার জন্যে তিনি গুরুদেবকে লেখাটি পড়তে দিলেন। তারপরে দিনের মনে দিন কেটে যায়। গুরুদেব ভারি ব্যস্ত মানুষ, সম্ভবত লেখাটি পড়ে মতামত জানানোর তাঁর আর সময় হয় না। এদিকে উৎসবের দিন দোরগোড়ায় এগিয়ে এসেছে। ব্যাকুল প্রমথনাথ একদিন মনে সাহস জুটিয়ে রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেই বসল, "গুরুদেব, আমি যে লেখাটা আপনাকে দিয়েছিলাম সেটা কি আপনি পড়েছেন?" এক মুহূর্ত থমকে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "তাই তো রে, আসলে তোর খাতাটা যে কোথায় রেখেছি আর খুঁজেই পাচ্ছি না। তুই আর একবার লিখে দে, এবার আমি ঠিক দেখে দেবো।" বলাই বাহুল্য, প্রমথনাথ আরও একবার রচনাটি লিখে দিলেন গুরুদেবকে এবং তিনি তখনই সেটি পড়ে দু' একটি জায়গায় সামান্য ভুল শুধরে দিয়ে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করলেন লেখাটির।

প্রমথনাথ তো খুব খুশি। এই ঘটনার পরে কেটে গেছে বেশ কিছু দিন। রবীন্দ্রনাথ তখন থাকেন দেহলীতে। একদিন কোনও এক প্রয়োজনে প্রমথনাথের সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন গুরুদেবের সাথে। কিশোর প্রমথনাথ গিয়েছে দেহলীর দোতলায় গুরুদেবের পড়ার ঘরে। গিয়ে দেখে গুরুদেব ঘরে নেই, দরজাটা হাট করে খোলা। ঘরে ঢুকে অপেক্ষা করতে করতে তার চোখ পড়ে গুরুদেবের লেখাপড়ার টেবিলটার দিকে। টেবিলের উপরে স্তূপীকৃত বইখাতা, লেখার সরঞ্জাম। বইয়ের পাতাগুলো পাশের খোলা জানালা দিয়ে আসা হাওয়ায় উড়ছে। হঠাৎ তার চোখ আটকে যায় মোটা মোটা বইগুলোর তলায় মুখ লুকিয়ে থাকা একটা ছোট্ট খাতার দিকে। একি, এটা তারই সেই খাতাটা না যেটাতে সে বসন্তোৎসবের আগে নিজের রচনাটি লিখে গুরুদেবকে পড়তে দিয়েছিল? এটা এখানে এলো কি করে? গুরুদেব যে বললেন খাতাটা খুঁজে পাচ্ছেন না। প্রমথনাথ আর নিজের কৌতুহল চেপে রাখতে পারে না। গুরুদেবের অনুপস্থিতিতে তাঁর কাজের টেবিলে হাত দেওয়া অনুচিত জেনেও কৌতুহলী কিশোর খাতাটা টেনে নেয়। পাতা ওলটাতেই প্রমথনাথ হতচকিত হয়ে পড়ে, পিঠের শিরদাঁড়া দিয়ে যেন বিদ্যুতের শিহরণ খেলে যায়। খাতার প্রায় প্রত্যেক পাতাতেই মার্জিনের ধারে গুরুদেবের নিজের হাতে লেখা নানান সংশোধনী । অবাক বিস্ময়ে কিশোর প্রমথনাথ দেখে একটি পাতায় লেখা, "এইখানে কি গুরুচন্ডালী দোষ হয় নাই?" আবার অন্য জায়গায় কোথাও লেখা, "ইহা কি বহুত্বদোষে দূষিত নয়?" বা "এইখানে কি অর্থ প্রাঞ্জল হইয়াছে?" ইত্যাদি নানান টিপ্পনী। খাতাটা যথাস্থানে গুঁজে দিয়ে প্রমথনাথ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে নিজের মনেই ভাবে, "গুরুদেব নিশ্চয় আমার উপরে খুব রেগে গিয়েছিলেন। কিন্তু কই, একটুও তো বুঝতে দিলেন না? আর তারপরে সব ভুলে গিয়ে এই লেখাটারই কত প্রশংসা করলেন।"

শীতের দুপুরে কলেজের স্টাফরুমে বসে গল্প বলা শেষ করে প্রৌঢ় শ্রী বিশী উৎসুক নবীন শ্রোতার চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথ রাগবেন না কেন? নানা সময়, নানা কারণে তিনিও রেগে যেতেন, তিনিও তো ছিলেন আপনার আমার মতো রক্ত মাংসেরই মানুষ। কিন্তু তিনি জানতেন যে আমার মতো এক অর্বাচীন কিশোরের উপর মুহূর্তের উত্তেজনায় রাগ করা যায় বটে, কিন্তু সেই রাগ প্রকাশ করা তাঁকে শোভা পায় না। আর তাই তিনি ছিলেন আমাদের সবার গুরুদেব, সাধারণ মানুষের থেকে মাপে অনেকটা বড়।"

Sannidhi Gupta, Age: 8

Cars

Sreejato Chatterjee (Age: 11)

Our tour starts in the past as we try to broadcast
This thing that ran on steam and ran on three wheels while steered-----
The first American automobile
That was pioneered!

The vehicle used in our interstate to bring us aboard,
We treat it as the lord that provides us with the cord
Of transportation, expansion of businesses, and produce city growth,
That was founded (or influenced) by Henry Ford.

While we give a standing ovation to this piece of transportation,
It can also cause harm despite its charm
Let me tell you why?
As it relates to specifically polluting our sky!

Gasoline, electric, solar - they are all fun!
Regular is gas, electric is power but solar is sun!

When Henry Ford was there,
His dream of a horseless carriage was in the air
That later came true out of the blue
When model T was built
Old ways of commuting suffered guilt!
It was the start of our fossil fuel...

Hungary, US, and Netherlands held on the start of the electric car,
When innovators from these countries including a blacksmith from
Vermont began toying with the innovation;
In the 1900's the French and English
Created the electric car in our nation!
It runs on wind, water, and wave energy
And is really cool for this century!

While it is really good,
Researchers have discovered
That when electric cars run on coal
It will fill our pollution hole!

Now it’s time for the one who trusts the big daddy sun!
That’s solar I’m talking about;
And the car may sometimes look like a UFO
But it can drive out...

While it is the eco friendly king
The solar panels are too costly!
They're also too slow and broken
And in winter it won’t run when it is frosty!

While we have electric and solar,
There is this one car that deserves an honor, hydrogen!
That runs on the retro source, steam!
Which is the future dream!

While hydrogen cars are the future
We are too short on the techniques for its fuel,
It also easily burns in fire and creates frostbites
But it makes the air free of bad fuel so it isn’t that cruel

Today we are thankful for Ford and his automobile!
It can take us to places like a far away bazaar,
As we all enjoy the benefits of the new era car!

Abjini Chattopadhyay, Age: 9

When I overcame my fears

Rohun Sarkar (Age: 9)

I have been brave a lot, but there was one time in particular, when I had to overcome my fears. This was during my first piano recital. It was during February 2013. During this recital, there were two judges and the winners would receive awards. I wished I would win first place. So far, I was #6 but I thought I wouldn't stand a chance in front of such a huge audience.

On the day of the recital, I had to wear a suit and tie. "*Today is the big day. Today is the big day*" - my mind was saying before the recital. I would be playing two songs. One of them would be "Horse Sense". It is a good thing that I didn't think about it on the ride there or then I would be stressed. When we got there I realized I would be going on stage at sixth place. When it was my turn, I relaxed. I felt my mind being cleared. I sent all the notes from my mind to my hands. I heard Oohs and Aahs from the crowd. I felt power in my heart to overcome fears...Done! Yes, I was finished! I was very proud of myself. I clapped when people did a nice job, and finally, the recital was done. Then everybody got a break. I was so excited I couldn't eat my snack.

Five minutes later, we went back to the auditorium for the Awards Ceremony. I didn't hear my name for 3rd place but then I heard it for 2nd place! Oh my! 2nd Place for my first ever piano recital!! Spectacular! Magnificent! Fantastic! Superb! I ran up on stage and held my trophy high. Everyone cheered as I grinned. I knew I would do a great job, but only "if I were brave", I whispered to myself.

An Ode to the Moon

Ronoy Sarkar (Age: 12)

Moon in the sky,
How beautiful you are!
Sometimes tiny silver,
And I long to get a sight
And sometimes a crescent.
Amidst the starry night,
You illuminate the dark night,
Like the pendent on the neckless of the sky.
Your powerful energy radiates back to earth,
And it's then, when I realize your true worth.
I like you best on full moon,
When the earth shines under your glow.
It fills my sleep with happy dreams
Oh! Moon, I love you so.

ছড়া

সিংহমশাই

ধন্য ধ্বন্যাত্মক ধ্বনি

দাঁত কনকন
মাথা ভনভন
বুক টনটন
করছে

পেট চুঁইচুঁই
কেঁদে কুঁইকুঁই
করে গাঁইগুঁই
ফিরছে

ধরে খপখপ
খেয়ে গপগপ
পেট ঢপঢপ
ফুলছে

সোডা চটপট
কিনে ঝটপট
ছিপি ফটফট
খুলছে

মেঘ থমথম
ডাকে গমগম
বারি ঝমঝম
ঝরছে

দেখে হালচাল
বকে আলফাল
লোকে পালপাল
মরছে ।

নিয়ম

সকালবেলা গন্ধমুখে মাজতে হবে দাঁত
দুপুরবেলা শাক-সব্জী উচ্ছে ভাতে-ভাত
যদি না রোজ মানো
বলে রাখছি জেনো
শরীরখানা বিগড়ে যাবে হইবে কুপোকাত ।

উপসংহার

মাংস ও মদ্য
খেয়ে খেয়ে হদ্দ
এখন বুঝতে পারি
তরকারি দরকারি

বড়বাবু

সাবানের ফ্যানা মেখে দাড়ি গোঁফ কেটে
বড়বাবু চলেন আপিসেতে হেঁটে ।
ট্রামে বাসে বড় ভিড় ঘাড় যায় মটকে
পাটভাঙা পাঞ্জাবী লোকে দ্যায় চটকে ।
ট্রামে বাসে যারা চড়ে সকলেই পস্তায়
বড়বাবু ভারি চালু, চলে যান সস্তায় ।

শব্দ বিভ্রম

নীলমনি ভট্টাচার্য

ভজহরি গুঁই, মানে আমাদের ভজাই ইংরেজির শিক্ষক বেনীমাধববাবুকে জিজ্ঞাসা করল, "স্যার, 'নাটুরে' কথাটার মানে কি?" বেনীমাধব ভক্ত পদ্মপুকুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজি পড়ান। পদ্মপুকুর জায়গাটা বেশ অজ পাড়াগাঁ। শহর থেকে মাত্র বিশ মাইলের মধ্যে যে এমন হতশ্রী গন্ডগ্রাম থাকতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এই গাঁয়ে চাষী পরিবার ছাড়া কয়েক ঘর কামার, কুমোড় আর ইঁটভাটায় কাজ করা কিছু মজুরের বাস। এদেরই ছেলেমেয়েরা এই স্কুলে পড়ে। তাছাড়া পাশের কয়েকটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম থেকে কিছু ছাত্রছাত্রীও এখানে পড়তে আসে। কয়েক বছর আগে সরকারের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় এই স্কুলটির পত্তন হয়েছিল। এখন টিকিয়ে ঢকিয়ে চলেছে।

বেনীমাধববাবু পাসকোর্সে বি.এ. পাস করে কিছুদিন কলকাতার এক বেসরকারি অফিসে কেরানির চাকরি করেছিলেন। সেই অফিস লালবাতি জ্বেলে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেশ কয়েক বছর বেকার ছিলেন। এই স্কুলটি চালু হওয়ায় বেনীমাধববাবু এখানে ইংরেজি শিক্ষকের চাকরি পান। ভজাইয়ের 'নাটুরে' কথাটি তিনি কোনওদিন শোনেননি। আগে হলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে বলে দিতেন যে এটা ইংরেজি শব্দই নয়। কিন্তু গত সপ্তাহেই সুবল বাগের কাছে বেনীবাবু লজ্জায় পড়েছিলেন। সুবল এবারে মাধ্যমিক দেবে, ও এসে ভজাইয়ের মতনই জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এরুডাইট' কথাটার মানে কি? বেনীবাবু এক ঝাঁকি মেরে বলেছিলেন, "দেখ সুবল, এরু টেরু বলে কোনও শব্দ ইংরেজিতে হয় না। সাহেবদের শব্দগুলো সব গম্ভীর, ওজনদার।" সুবল তবুও জোর করতে লাগলো যে এই শব্দটা ও দেখেছে।

বেনীবাবুর পাশের বাড়িতে হারু, মানে হারণ ঘোষ থাকে। হারুর ছেলে বারিদ কলকাতায় থেকে কি যেন পড়ে। বারিদ ফি শনিবার পদ্মপুকুরে চলে আসে, রবিবার চলে যায়। বারিদের ছোট্ট ফোনে না কি গোটা অভিধানটা ভরা আছে। বেনীবাবু বারিদকে 'এরুডাইট' কথাটা অভিধানে দেখতে বলেন। বারিদ এক মিনিটেরও কম সময়ে ঔ ফোন থেকে 'এরুডাইট' কথাটার অর্থই শুধু নয় একটা গোটা সেনটেন্স বলে দিলো, "The most erudite people in medical research attended the conference." বেনীবাবু তো হতবাক। কালে কালে হলটা কি? পৃথিবীর সব ইংরেজি শব্দ ওই ফোনে আটকে থাকবে!

এখন ভজাইয়ের সামনা সামনি হলেই বেনীবাবু আতান্তরে পড়েন। 'নাটুরে' মানে কাল, পরশু করে শনিবার পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন। শনিবার বারিদের কাছে গিয়ে 'নাটুরে' কথাটা অভিধানে দেখতে বললেন। বারিদ মিনিট দশেক চেষ্টা করেও শব্দটার মানে বার করতে না পেরে বেনীবাবুকে বললো, Nu এবং Nou ধরে সব শব্দ খুঁজেও 'নাটুরে' পাইনি। বেনীবাবু বিমর্ষ হয়ে ফিরে এলেন।

সোমবার বেনীবাবু ভজাইকে ডেকে বললেন, "দেখ, এই 'নাটুরে' শব্দটার মানে জানি না। যদি বানানটা জেনে আসিস, তবে চেষ্টা করতে পারিস" ভজাই উত্তেজিত হয়ে বলল, "হ্যাঁ স্যার, বানানটা জানি বৈকি! এন-এ-টি-ইউ-আর-ই।" বেনীবাবু বানানটা শুনেই লাফিয়ে উঠলেন, "হারামজাদা, তুই মাস্টারমশায়ের সাথে ইয়ার্কি মারছিস। তুই নেচারকে নাটুরে বলে সারা সপ্তাহ আমাকে জ্বালিয়ে মেরেছিস। তোকে ইস্কুল থেকে না তাড়ালে আমার নাম......"

ভজাই বেনীবাবুর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে, "স্যার, আপনি আমায় স্কুল থেকে তাড়াবেন না। স্কুল থেকে তাড়ালেই বাবা আমায় ক্ষেতে জুতে দেবে, আমার 'ফুটুরে (Future)' বলে আর কিছু থাকবে না।"

What *Swadhinata* Meant to Me

Nitya Nath

A couple of months back, I was chatting on the phone with my young niece in India. We were talking about the partition of India and its independence struggle around the time of the Independence Day in 1947. She wrote me in a follow-up letter, "Jethu (uncle), at the time of independence, what did '*Swadhinata'* mean to you?" The following is an excerpt of what I wrote to her.

I was 12 years old then and the concept of the British rule was not so clear to me yet. I could only feel the tremors around me.

Our only sources of awareness were lectures by independence movement leaders as conveyed through newspapers and occasional local assemblages. Sigh! Where was the social media then?

Swadhinata (Independence), we did not feel very much in our blood vessels! For us soon to be uprooted from our homeland in East Bengal / East Pakistan (today's Bangladesh), there were more serious calls for survival. We came to India as refugees – which remained stuck in my mind for many years. I felt little bit of personal freedom at the age of 13 when I was moved to Shibpur, Howrah, and admitted in the 9th grade there. Howrah was close to Kolkata, so there was some excitement in that move. I thought I was going to see more of life there. Lo and behold, after a few months, I was taken back to our home in Bagerhat for summer vacation (or such) and was never returned, for reasons unknown to me, after *Buro-koda* (my great grandfather) Raicharan Nath passed away. I had to restart my schooling in Bagerhat. Because of the difference in curriculum, especially in English, Bengali and History (as more importance was given on Islamic History in Bangladesh), my academic performance suffered to some extent – yet this change created an unnecessary anxiety in me. After two years in Bagerhat, I was back to Shibpur, this time starting college. I was admitted by one of my uncles in Vidyasagar College, in the heart of Kolkata, where classes were like a bazaar packed with too many students. At the first opportunity, I shifted myself to Presidency College – now the Presidency University.

For whatever reason, I felt some independence in Presidency College. It was a very open place, with a big central lawn and a big library. We could freely move anywhere within the campus. The student community was very alive, and we had some of the best teachers there. It felt like utopia. The freedom that I felt was on an intellectual level (not much to do with political freedom). Open discussions among friends felt like freedom at the beginning of youth. Many of my contemporaries came from Bangladesh under the intense political/racial unrest, just as I did. This created an extra bond between some of us. Unfortunately the year I got into college (1950), Presidency College stopped admitting girls in the intermediate class. So we had to wait two more years till the Bachelors program for some chance of feminine companionship.

We were very proud that some of India's leaders were students of Presidency. For example, Subhas Bose. We heard how Subhas Bose fought against an English Professor's highly derogatory comments about Indians, and that he was thrown out of the college for that reason. The Principal wanted Subhas Bose to be thrown out of the university, which formed the umbrella for all colleges. Ashutosh Mukherjee, the then Vice-Chancellor, intervened and found a place for Subhas Bose in, I believe, Scottish Church College. Stories like this cheered

our hearts. We felt good about the protesters of the British rule. Aurobindo Ghosh (later Shri Aurobindo) was tried in court for his revolutionary efforts to uproot the British government in India. Chittaranjan Das, the renowned Barrister, told the Judge in session, 'you touch this man, and the whole India will be on fire'! Aurobindo was freed, and became a Sannyasi almost overnight. Naren Datta (Vivekananda) studied partly in Presidency College. There were many others who walked the hallways of Presidency. We, students, were very proud of it. Many political movements started at Presidency College, including the Naxalite movement. I think there was an air of freedom (swadhinata) inside Presidency College, freedom from fear and from any governance – in a broad sense freedom from any outside insurgents!

Losing our home and business (in what is Bangladesh now) was very hard for my elders. My father was like a lord in Bagerhat. Seeing him broken and trying once again to build up a business, but not succeeding really, was very painful for me. Yet, the partition brought us to Kolkata, the primary cultural center of Bengal. Yet, the British was instrumental in bringing European culture to our doorway and opening educational institutions that, in time, let us breathe fresh air.

Amidst a country struggling for its identity on an existential, political and social level, this was my real, personal experience of freedom.

Wising You All

Our Best

CVAA -DC

Executive Committee

সেঁজুতী

মিতালী সাহা

সে আঁচলের আড়ালে ছোট্ট প্রদীপ নিয়ে চলে
এ আগুন ছড়িয়ে গেলে হবে দাবানল।
সে অন্ধকারে শুকনো পাতায় সাবধানে পা ফেলে চলে
এ পদশব্দ প্রতিদ্ধনিত হলে হবে ভূমিকম্প।
সে চোখের সামান্য দু'ফোঁটা জল সামলে নিয়ে তাকায়
এ জল ছলকে পড়লে হবে প্লাবন।
সে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সুপ্তি ভুলে বিনিদ্র রাত জাগে
এ নিঃশ্বাস সত্যি বইলে যে উঠবে উত্তাল প্রলয়।
তাই সে আজ হয়েছে নীলকণ্ঠ, পৃথিবীর সব বিষ পান কোরে
এ ব্যাধি ছড়িয়ে গেলে হবে সর্বনাশা মহামারী।

Scotland-এর Highland-এ

(একটি আধুনিক বাংলা গান)

সব্যসাচী গুপ্ত

দূরের পাহাড় কাছের হ্রদ ডাকে আমায়,
সুনীল আকাশ সাদা মেঘে ঘন কুয়াশায়।
স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গনে,
তুষারাবৃত অঙ্গনে,
মন মোর উড়ে যেতে চায়।

যতদূর দৃষ্টি যায় সবুজ প্রান্তর,
মহানন্দে চরছে মেষ বন বনান্তর।
এহেন দৃশ্যে কার না চোখ জুড়ায়?
বিশ্বমায়ের এ বিচিত্র লীলায়,
তোমার পরশ পাই মোর হিয়ায়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় - বি ই কলেজ, এক ভালবাসার মহাকাব্য

শ্যামল দাসগুপ্ত

বহু বছর পরে, যখন শেষ পারাণির খেয়ায় ওঠার দিন গুনছি, তখন মনে পড়ে গেল সেই সুদূর অতীতের এক দুপুরের কথা, যখন বাবার সঙ্গে এসেছিলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত বি ই কলেজের হস্টেলে থাকতে। উৎসবের প্রদীপ জ্বালানোর আগে যেমন সলতে পাকানোর কাজ করতে হয়, বাড়িতে বিতর্ক জমে উঠেছিল - যাদবপুর না কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। শেষ পর্যন্ত বাবার ভোটে কলকাতা জিতে গেল - আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কলকাতা, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর, বিধানচন্দ্র রায়ের কলকাতা, আমার গন্তব্য নির্ধারিত হয়ে গেল। আমার প্রথম বছর, ১৩ নম্বর হস্টেল। জিনিসপত্র গুছিয়ে দিয়ে বাবা যখন চলে গেল, তখন ১২ নম্বর হস্টেলের ছাদের ট্যাংকের উপর থেকে সুয্যিদেব তার রক্ত ছড়াচ্ছিল, একটু পরেই ঝুপ করে আঁধার নেমে এসেছিল - ডাইনিং হলটাকে এক ঐতিহাসিক দুর্গের মতো লেগেছিল আর পাশের বি গার্ডেনের ছায়াঘন গাছপালা, সেইখান থেকে ক্ষণে ক্ষণে ভেসে এসেছিল শিয়ালের ডাক। আলো অবছায়ায় হঠাৎ করে উদয় হয়েছিল ছাঁটা গোঁফ আর কোঁকড়ানো চুলওয়ালা অভীকের। জিজ্ঞেস করেছিল, সব ঠিকঠাক আছে? শনিবার সবাই বাড়ি গেছে, সোমবার থেকে গুলজার শুরু হয়ে যাবে। ভাবিস না, কালকে রামকৃষ্ণপুর লঞ্চঘাট থেকে গঙ্গা পেরিয়ে ময়দানে খেলা দেখতে যাওয়ার আছে, মোহনবাগান - বালি প্রতিভা, যাবি তো বল। সেই ঠিকঠাক পর্ব শুরু হয়ে চলেছিল পাঁচ বছর - কলেজ যখন ছাড়লাম, আজ থেকে চৌত্রিশ বছর চার মাস আগে, সেই কেটে যাওয়া বছরগুলো আজ শুধু মাত্রই একটা সংখ্যা। প্রত্যেকটা দিনই, এখনও মনে হয়, এই তো সেদিনের কথা। মস্তিষ্কের কোষে, রক্তের ডি-এন-এতে মুদ্রিত হয়ে আছে সে সব দিনগুলো।

প্রথম দিন ক্লাস হয়েছিল হিউম্যানিটিস ডিপার্মেন্টে, আলো-আবছায়ায় ভরা এক বিশাল গ্যালারিতে। সে ঘরের কড়ি-বর্গাওয়ালা ছাদ থেকে এক বিষন্ন হাওয়া সারা ঘরে ঘুরপাক খাচ্ছিল - দেখেছিলাম ক্লাসের এক-তৃতীয়াংশ ভর্তি বাকি অংশে সব ছায়ামূর্তি বসে আছে আর মাঝে মাঝে তারা শুট্-শাট্ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সারা ক্লাস জুড়ে এক গভীর জলোচ্ছাসের শব্দ ভেসে আসছে। এর মধ্যে অধ্যাপক মহাশয় গলার নীল শিরা ফুলিয়ে, প্রাচীন গ্রীস সভ্যতা ও সমাজ জীবনের উপরে এক তার প্রভাব নিয়ে জ্বালাময়ী কিন্তু অবোধ্য ভাষণ দিয়ে চলেছেন। হঠাৎ দেখলাম তিনি প্রচন্ড উত্তেজিত হয়ে চতুর্থ সারির এক 'অশরীরী' ছাত্রকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "উঠে দাঁড়াও, তোমার রোল নম্বর কত?" ছাত্রটি সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিল "সাড়ে সাত স্যার।" সমুদ্রের এক বিশাল জলোচ্ছ্বাস আছড়ে পড়ল বেলাভূমিতে। আর লকগেটের ছাড়া পাওয়া জল তীব্র গতিতে বেরিয়ে যেতে লাগল ক্লাস ছেড়ে। বিশাল ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা হল, "হাম কিসিসে কম নেহি" (সেই সময়ের এক বিখ্যাত হিন্দি চলচিত্র)।

সেই ছিল শুরু। পরবর্তীকালে আমি যার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলাম, তিনি ছিলেন রসায়নের অধ্যাপক। যিনি এনট্রপি, থার্মোডায়নামিক্স পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে জীবনের জটিলতার গূঢ় তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন। মধ্যপন্থা নেওয়ার যে দর্শন তিনি মাথার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, বহু যন্ত্রনা নিয়ে আজও তা বহন করে চলেছি। বি ই কলেজে ঢুকেছ, তিনি উদাসিন মুখ করে বলেছিলেন, প্রথম বা দ্বিতীয় হবার চেষ্টা করো না। জীবন যে সুপক্ক যবের ঘ্রাণ তা বুঝতে পারবে না, দেখতে পাবে না কাঠবিড়ালির হুটোপুটি, পড়ন্ত বিকেলে বি গার্ডেনের মোলায়েম হাওয়ার আদর অথবা গঙ্গা পেড়িয়ে উৎসবের শহরের কিসিম মজা। আর শেষের দিকে থাকার প্রলোভনটাকেও জয় করতে হবে - শেষে থাকার বড় যন্ত্রনা, জীবন যুদ্ধে এক অসুস্থ সৈনিকের মত অবস্থা হবে, রবি ঠাকুরের "বাসবদত্তার" মতো পাঁচিলের বাইরে ফেলে দিয়ে সবাই এগিয়ে যাবে।

যাই হোক, সেই রোমাঞ্চকর ভাবে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা সবসময় 'সুখদা ভবতি' ছিল না। সাপ্লির হাতছানি, সেকেন্ড ক্লাসের রক্তচক্ষু, হাফ ইয়ারলি, অ্যানুয়ালের ভয়াবহ যন্ত্রনা আর ক্লাস টেস্টের খুচরো কষ্ট - হার্টের আয়ু যে অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু যা সবকিছুকে ভুলিয়ে দিয়েছিল, তা হল মুক্তির স্বাদ, বাঁধন ছেঁড়ার আনন্দ। পকেটে এক প্যাকেট চারমিনার নিয়ে, ইন্সটিটিউট হলে, সিগারেট টানতে টানতে, ঝিরঝির করা পর্দায় শোলের 'আব তেরা ক্যায়া হোগা কালিয়া'-র উত্তেজনা, কিংবা রাত দুটোর সময় সেমেটারির পাঁচিল টপকে ভুত খুঁজতে নামা, তার কোনও জুড়ি আজও পাই নি।

কলেজে যখন ঢুকি, তখন সারা দেশে জরুরী আবস্থা চালু ছিল। এক চাপা, দমবন্ধ পরিস্থিতি, চতুর্দিকে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে জোর করে গলা টিপে ধরা হচ্ছে, বি ই কলেজেও তার ব্যাতিক্রম ছিল না। সেই অস্থির সময়ে, সেই সন্ত্রাসের সময়ে, নৈশ অভিযানে বেরিয়ে বন্ধুরা মিলে লাগিয়ে দিতাম পোস্টার 'তানা-শাহী নেহি চলেগা', হস্টেলে চোরাগোপ্তা লিফলেট বিলি, যাতে সে প্রতিবাদ ছড়িয়ে পরে অন্যান্য জায়গায়। এই ছিল বি ই কলেজ, যে আমায় শিখিয়েছিল প্রতিবাদের ভাষা, কতিপয় অসংস্কৃত ছাত্রনেতার নীল রক্তের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে মেলে ধরেছিলাম প্রতিবাদের স্পর্ধা - সেই কলেজের জন্যে আজও আমার গর্ব বোধ হয়। কত উজ্জ্বল তারকাকে লালন করেছে এই কলেজ - যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত,

বাদল সরকার, বিনয় মজুমদার, বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত, নারায়ণ সান্যাল এবং আরও অনেকে। কিন্তু আক্ষেপ থেকে যায় সামগ্রিকভাবে এই কলেজ কোনদিন বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক প্রতিবাদী পরিমন্ডলের অংশ হয়ে উঠতে পারে নি। এমনকি স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল দিনেও বি ই কলেজের অংশগ্রহনের কোনও খবর আমাদের কাছে নেই। এ ব্যাপারে অন্য কোনও রকম তথ্য থাকলে আর তা জানতে পারলে ভাল লাগবে। বোধহয় যে অভিজাত পরিমন্ডলের আবহে এই কলেজের জন্ম ও উত্থান, মেকলে সাহেবের চিন্তা-ভাবনার সফল রূপায়নের ফলে, বি ই কলেজ কোনও দিন বাংলাদেশের রেনেসাঁস বা দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অংশ হয়ে উঠতে পারে নি। অবস্থার পরিবর্তন হয় ৭০-এর দশকে এসে, অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশের মূল স্রোতে যুক্ত হয়ে যায় কলেজ।

১৯৭৮ সালের ভয়াবহ বৃষ্টি স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে। ক্ষান্ত বর্ষণ নয়, তিনদিন ধরে প্রবল, অবিরাম সে বৃষ্টি। বারো নম্বর হস্টেলের চারতলার ঘরে বসে দেখতাম ফুসলে ওঠা গঙ্গার জলে বৃষ্টির ঝারি ঝরছে, আর জলোচ্ছ্বাস আছড়ে পড়ছে শালিমার ঘাটে। সারা কলেজ ক্যাম্পাস জলে ডুবু ডুবু। অবিরল ফোঁটা পড়ছে লাভার্স লেনে, মডেল স্কুলের ছাদে, ডাইনিং হলের গম্বুজে, আড়াই নম্বর গেটে। মাঝে মাঝে যখন বৃষ্টি ধরে আসছিল, ধড়মড় করে উঠে পড়ছিলাম, কারণ অবিরাম বৃষ্টির শব্দ একটা নরম গানের মতন, একটা মনসুন সোনাটার মত শুনতে লাগছিল। সেই সুরের জাল যখন ভেঙে যাচ্ছিল, উঠে পড়ছিলাম, আবার বৃষ্টি শুরু আবার ঝিমুনি। সেই তিনদিন দুবেলা খিচুড়ি আর লাবড়া খেয়েছিলাম, সেই অমৃত-সমান লাবড়ার গন্ধ যেন আজও আঙ্গুলে লেগে আছে।

চৌত্রিশ বছর চার মাস পনেরো দিন পরে যখন বি ই কলেজের ফার্স্ট গেটে দাঁড়িয়েছিলাম, সেই বৃষ্টিস্নাত কলেজ বিল্ডিং চোখের সামনে সজল হয়ে উঠেছিল - বাবার সঙ্গে কুণ্ঠিত, ভয়ার্ত চোখে একদিন যখন যেখানে ঢুকেছিলাম, তখন ভাবি নি জীবনের কত উদ্বেল সময়, কত মনে না থাকা পুরনো কথা, কত দুঃসময়, প্রেমে-অপ্রেমের বিক্ষত মুহূর্ত, কত বন্ধু, সাথীদের স্মৃতি, কত নস্টালজিয়া এখানে জমা রেখে গেছিলাম। সেই ইট-কাঠ-কংক্রিটের বিল্ডিং সার করে নিয়ে এলো ফেলে আসা কত অনিশ্চয়তা, ব্যর্থতা আর সাফল্য ও ভালোবাসার কথা।

Best wishes
to all Calcutta University
Alumni

From
Biswas Family
Roopa, Dhruba, Deep and Diya

সংখ্যাতত্বের ইতিহাস ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান

অলকা চক্রবর্তী

সংখ্যাতত্ব বা Statistics এর নাম শুনলেই যাঁরা Disraeli সেই বিখ্যাত উক্তি "lies, damned lies and Statistics" বলে বাঁকা হাসেন, আমি সেই দলে নই। তবে একটা কথা মানতেই হবে, প্রাচীন এই বিজ্ঞানশাখার পরিচিতি তুলনামূলকভাবে সীমিত। আজ এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার ইতিহাস ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অবদানের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

মহাভারতে নলরাজার উপাখ্যানে রাজা ঋতুপর্ণ রাজ্যের পর্ণের হিসেব করেছিলেন একটি বিভীতক শাখার সাহায্যে। একটি শাখায় পাতার সংখ্যা সেই গাছের শাখার সংখ্যা দিয়ে গুণ করে তিনি প্রকৃত সংখ্যার খুব কাছাকাছি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন, যার সাহায্যে নলরাজা তাঁর রাজত্ব ফিরে পান। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের গ্রীসে Platea র প্রাচীরে ক'টি ইঁট ব্যাবহার হয়েছিল তাও এই ভাবে আন্দাজ করা হয়। মিশরীয় সভ্যতায় নীলনদের গভীরতা মাপতে ও শষ্যের হিসাব রাখতে, গ্রীসে আদমসুমারী ও যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিতে সংখ্যাতত্বের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। নবম শতাব্দীতে আল-কিন্দীর রচনায় সংকেতবার্তা পাঠাতে, দ্বাদশ শতাব্দীতে মুদ্রার শুদ্ধতা পরীক্ষায় সংখ্যাতত্বের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

ষোড়শ শতাব্দীতে নক্ষত্রবিদ্যায় প্রয়োগ আধুনিক সংখ্যাতত্বের জন্মকাল বলে গণ্য করা হয়। যে কোন গণনায় error এর যে এক বিশেষ ভূমিকা আছে, ও বারবার গণনায় তা আন্দাজ করে প্রকৃত সংখ্যার কাছাকাছি আসা সম্ভব তা Tycho Brahe ও অন্যান্য জ্যোর্তিবিদ প্রথম জানান। জ্যাতির্বিদ্যা, আদমসুমারী, পরমাযু-তত্ব এমনকি, জুয়া-র আসরে যে এর সুদূরপ্রসারী ব্যবহার তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু যেটা আমরা অনেকেই জানিনা যে Florence Nightingale মহিলা পরিসংখ্যানবিদদের পথিকৃত। উনি Royal Statistical Society প্রথম মহিলা সদস্যা ছিলেন এবং ক্রিমিয়ান যুদ্ধের হতাহতর হিসেব রাখতে প্রথম গ্রাফের ব্যবহার করেন। Epidemiology এর প্রতিষ্ঠা করায় ওঁনার অবদান অনস্বীকার্য।

ইতিহাসের কথা বলতে গেলে একটি সরলরেখায় আলোচনা করা দুস্কর, বিশেষতঃ বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে যে গতিতে তাত্বিক ও যন্ত্রগণক-ভিত্তির ফলিত গবেষণার বিস্ফোরণ ঘটেছে, এই সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে তার আলোচনা সম্ভব নয়। তাই আলোচনা শুধুমাত্র তার আগের বিকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলাম। ১৯৯৭ থেকে তো "Big Data' ও analytics এর জয়যাত্রা। বাংলায় যথার্থ পরিভাষার অপ্রতুলতার কারণে এখানে একটি তালিকা (পরের পাতায়) ইংরেজীতেই তুলে ধরলাম।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান

ভারতীয় উপমহাদেশে সংখ্যাতত্বের সূতিকাগার প্রকৃত অর্থেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনক শ্রী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। তাঁর অনেক সহকর্মীই এই বিজ্ঞানশাখায় উৎসাহিত হন ও প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগে Statistical Laboratory প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর প্রমথ নাথ ব্যানার্জী (অর্থনীতির মিন্টো অধ্যাপক), নিখিল রন্জন সেন (গণিতের খয়রা অধ্যাপক) ও স্যার আর এন মুখার্জী-র উপস্থিতিতে একটি আলোচনা সভা বসে। তার ফলে Indian Statistical Institute -র জন্ম, যা ২৮শে এপ্রিল, ১৯৩২ এ একটি অলাভজনক বিদ্যায়তন বলে নিবন্ধিত হয়। তখনো এটি প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগেই অবস্থিত ছিল। ক্রমশঃ কর্মপরিধি বিস্তৃত হয়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ছাড়াও এস এস বোস, রাজচন্দ্র বসু, এস এন রায়, আর আর বাহাদুর, গোপীনাথ কল্যাণপুর, সি আর রাও প্রভৃতির কর্মালোকে বিভাসিত হয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর সহকারী ও প্রথমযুগের ছাত্র শ্রী পীতাম্বর পন্থের অর্থানুকূল্যে এই প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃতি ঘটে। ১৯৩৩ সালে উপমহাদেশের সংখ্যাতত্বের প্রথম জার্নাল 'সংখ্যা' প্রকাশিত হয়। ১৯৩৮ সাল থেকে স্নাতকোত্তর উপাধি দেওয়া শুরু হয়। ১৯৫৮ সালে Indian Statistical Institute প্রেসিডেন্সী কলেজ তথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিতি পায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বতন্ত্রভাবে প্রথমযুগ থেকেই এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। অসামান্য শিক্ষকমন্ডলী ও প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীর ফলে পৃথিবীর যে কোন সংখ্যাতত্ব বিভাগেই একজন প্রাক্তনীর দেখা মিলবে।

A concise timeline of Statistics and Probability

Name	Nationality	Birth	Contribution
Bayes, Thomas	English	1702	Developed the field of probability now known as Bayes theorem
Laplace, Pierre-Simon	French	1749	Co-invented Bayesian statistics, invented exponential families (Laplace transform) and other distribution theory
Gauss, Carl Friedrich	German	1777	Invented least squares estimation methods (with Legendre). Used loss functions and maximum-likelihood estimation
Galton, Francis	English	1822	Invented the concepts of standard deviation, correlation, regression
Pearson, Karl	English	1857	Numerous innovations, including the development of the Pearson chi-squared test and the Pearson correlation. Founded the Biometrical Society and Biometrika, the first journal of mathematical statistics
Spearman, Charles	English	1863	Extended the Pearson correlation coefficient to the Spearman's rank correlation coefficient
Gosset, William Sealy(aka"Student")	English	1876	Discovered the Student t distribution and invented the Student's t-test
Fisher, Ronald	English	1890	Wrote the textbooks and articles that defined the academic discipline of statistics. Developed the analysis of variance, Fisher information, and many theoretical concepts for the design of experiments
Mahalanobis, Prasanta C	Indian	1893	Founder of Indian Statistical Institute and key player in introducing Statistics to India. Founded Sankhya, first statistical journal in the Indian subcontinent. Developed Mahalanobis distance, seminal sample survey techniques and quantitative linguistics methods.
Neyman, Jerzy	Polish-American	1894	*Discovered the* confidence interval *and co-developed the* Neyman–Pearson lemma
Deming, W. Edwards	American	1900	Developed methods for statistical quality control
Kendall, Maurice	English	1907	Co-developed methods for assessing statistical randomness; invented Kendall tau rank correlation coefficient
Tukey, John	American	1915	Jointly popularized Fast Fourier transformation, pioneer of exploratory data analysis and graphical presentation
Rao, Calyampudi Radhakrishna	Indian	1920	Co-developed Cramér–Rao bound and Rao–Blackwell theorem, invented MINQUE method of variance component estimation.
Efron, Bradley	American	1938	Invented the bootstrap resampling technique for deriving an empirical distribution of an estimate of a model parameter

Adapted from https://en.wikipedia.org/wiki/Founders_of_statistics

Reference

1. History of Statistics - https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_statistics
2. Mala Bhattacharjee et al, Pioneer Mathematicians And Their Role In Calcutta University During The Nineteenth And Twentieth Century, http://www.insa.nic.in/writereaddata/UpLoadedFiles/IJHS/Vol48_2_11_MBhattacharjee.pdf
3. Nalini Krishnankutty, 1996. Putting Chance to Work: A Life in Statistics: A Biography of C. R. Rao.
4. Ashok Rudra (1996). Prasanta Chandra Mahalanobis: A Biography. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-563679-6
5. *Celebrating statisticians: Florence Nightingale* http://blogs.sas.com/content/jmp/2013/02/04/celebrating-statisticians-florence-nightingale/

জীবন যেরকম

লোকেশ ভট্টাচার্য

সকালবেলা ফোনটা বেজে উঠতে সেটা তুলে সুপ্রকাশ ''হ্যালো'' বলতে ওপাশ থেকে ভেসে এল প্রদ্যোতের গলা, ''আপনারা কেমন আছেন, প্রকাশদা? অনেকদিন কথা হয় না।''

''হ্যাঁ, অনেকদিন বাদে তোমার ফোন পেলাম। আমারও ফোন করা হয়ে ওঠে না। আজকাল সবাই ব্যস্ত। তা আমাদের খবর ভালোই, কেটে যাচ্ছে। কমপ্লেন করার মত কিছু নেই। তোমাদের কি খবর? শর্মিষ্ঠা, লিসা কেমন আছে?''

''আমরা সবাই ভালো আছি, প্রকাশদা। ক'দিন আগে লিসার একটু জ্বরের মত হয়েছিল, এখন ভালো আছে। একটা খুব দরকারে পড়ে আপনাকে ফোন করছি, প্রকাশদা। আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না।''

''সেটা তুমি কি বলবে তার উপর নির্ভর করছে। আগে তো তোমার দরকারটা কি বল, শুনি। তারপর মনে করব কি করব না সেটা ভেবে দেখা যাবে।''

''আপনাদের ওখানে লোক নিচ্ছে দেখলাম।''

''হ্যাঁ, আমাদের অফিসে বেশ কিছু লোক নিচ্ছে তো বটেই। কয়েকটা বড় কন্ট্রাক্ট পেয়েছি আমরা। আমাদের ধারণা কোম্পানী আরও অনেক বড় হবে। তুমি কি অ্যাপ্লাই করবে ভাবছ নাকি?''

''মানে, একটা পজিশন দেখলাম আমার রেজিউমের সঙ্গে খুব মিলে যায়।''

''সে তো খুব ভালো খবর। অ্যাপ্লাই করেছ?''

''হ্যাঁ, আপ্লিকেশন তো পাঠিয়ে দিয়েছি, প্রকাশদা। কিন্তু সকলেই বলছে একটু চেনাশোনা না থাকলে আপনাদের ওখানে চান্স পাওয়া যায় না। অত বড় আর রেপিউটেড কোম্পানী। অনেক লোক তো নিশ্চয় অ্যাপ্লাই করবে। তাই আপনাকে ফোন করছিলাম।''

''না, না আমাদের কোম্পানীতে চেনাশোনা খুব একটা ম্যাটার করে না। লোকে ওটা একটু বাড়িয়ে বলে। তবে তোমাকে তো এতদিন দেখছি, তোমার মত ডেডিকেটেড এবং ইন্টালিজেন্ট ছেলে আমি খুব বেশী দেখি নি। তোমার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব। তোমার রেজিউমের একটা কপি ই-মেল করে আমাকে পাঠিয়ে দিও। আর দেখবে প্রত্যেকটা পজিশন ডেসক্রিপশনের সঙ্গে একটা আইডেন্টিফাইং কোড আছে। আমাকে সেই কোডটাও পাঠিও। ওটা থেকে আমি বুঝতে পারব কোন পজিশনটার কথা তুমি বলছ, আর কাকে ধরতে হবে।''

দিন সাতেক পরে প্রদ্যোতের ফোন, ''প্রকাশদা, আমার ব্যাপারটা একটু দেখেছিলেন?''

''তোমাকে তো আমি একটা ই-মেল পাঠিয়ে দিয়েছি কাল রাতে। পাওনি?''

''না তো।''

''দেখ, হয়ত স্প্যামে গিয়ে বসে আছে। চেক্ করে দেখ। আজকাল এই হয়েছে এক মুস্কিল। ওই পজিশনটা ফ্লেচারের কাছে। আমার খুব বন্ধু। আমরা এক সঙ্গে ওখানে জয়েন করেছিলাম। সে আজ কত বছর হয়ে গেল। তখন কোম্পানী খুব ছোট ছিল, বুঝলে। তা যাই হোক, ওকে বলতেই ও এক কথায় রাজি হয়ে গেল। বলল, 'তুমি যখন রেকমেণ্ড করছ, এর উপর আর কথা থাকতে পারে না।' অবশ্য তোমাকে একটা ইন্টারভিউ দিতে হবে। আইন বাঁচিয়ে চলতে হয় তো। ইন্টারভিউতে যদি খুব খারাপ না কর, আর তুমি যে করবে না সে বিশ্বাস তোমার উপর আমার আছে, তোমার হয়ে যাবে, ও আমাকে কথা দিয়েছে। ওরা বোধহয় সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।''

বছর পাঁচেক পরের কথা। শনিবার সকালে সুপ্রকাশের ফোন, ''প্রদ্যোৎ, একটা খুব দরকারে পড়ে তোমাকে ফোন করছি ভাই। তোমার হাতে একটু সময় আছে এখন?''

''লিসার নাচের ক্লাস আছে, ওকে নিয়ে বেরুবো। কিন্তু সে এখনও দশ-পনের মিনিট দেরী আছে। বলুন।''

''আমি সাধারণত আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কারুর কাছে হাত পাতি না। কিন্তু মনে হল, হাত পাততে হলে শুধু তোমার কাছেই পাতা যায়।''

''বলুন না, এত কিন্তু কিন্তু করছেন কেন?''

''আমার গাড়িটা খুব গণ্ডগোল করছে, একটা নতুন কেনা খুব দরকার।''

''কিনে ফেলুন, কিনে ফেলুন। আমি তো এখানে এসে থেকে আপনার ওই এক গাড়ি দেখছি। কত বছর হল?''

''তা হয়েছে অনেক দিন। দশ বছর পেরিয়ে গেছে।''

''প্রকাশদা, এবার একটা লেক্সাস কিনে ফেলুন। আপনার মত লোকের ক্যামরি চালানো ভালো দেখায় না।''

''ধুর, কি যে বল, আমার যা হোক একটা গাড়ি হলেই হয়। এবার ভাবছি একটা সুবারু কিনব। কনজিউমার রিপোর্টে তো বলছে, মাঝারি দামের মধ্যে সবচেয়ে ভালো গাড়ি। অল হুইল ড্রাইভ, সেফটি রেকর্ড নাকি খুব ভালো। বয়স হয়ে গেছে, রিফ্লেক্স কমে গেছে। এখন একটু সেফটি রেকর্ড দেখে গাড়ি কেনা ভালো। কিন্তু একটা খুব মুস্কিলে পড়ে গেছি। আমার ক্রেডিট রেকর্ডে একটু গণ্ডগোল হয়ে আছে। ওরা খুব বেশী ইন্টারেষ্ট রেট চাইছে, আঠারো পার্সেন্ট।''

‘‘বাবা, এত বেশী। এমনিতে তো আজকাল চার-সাড়ে চার পার্সেন্ট রেট! কিন্তু আপনার ক্রেডিট রেকর্ড খারাপ হল কি করে? ডিফল্টার হয়েছিলেন নাকি?’’

‘‘না না, কোনদিন নয়। আমি চিরকাল মাসের শেষে প্রত্যেকটা ক্রেডিট কার্ড, মর্টগেজ, পুরো পে করে দিই।

‘‘তা হলে?’’

‘‘তা হলে যে কি, আমি নিজেই ঠিক মত জানি না। আমার ব্যাঙ্কে হ্যাকিং হয়েছিল মাস কয়েক আগে। ওরা সেখান থেকে আমার সোস্যাল সিকিউরিটি নম্বর, জন্মদিন আর সব পার্সোনাল ইনফরমেশন চুরি করেছে। তাতেই কিছু একটা হয়েছে। আমার ক্রেডিট স্কোর হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেছে। আর তাতেই হয়েছে মুস্কিল।’’

‘‘ইস, সেটা তো খুব মুস্কিলের ব্যাপার। আপনার ব্যাঙ্ক কিছু করতে পারছে না। আসল দোষ তো ওদের।’’

‘‘বলছে, ওরা ইনভেস্টিগেট করছে। শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওরা কিছু করতে পারবে না। তুমি আমাকে একটু সাহায্য করবে?’’

‘‘বলুন।’’

‘‘তোমার তো ক্রেডিট স্কোর নিশ্চয় খুব ভালো। তুমি যদি গ্যারান্টার হও। বলছে একজন কেউ যদি লোন গ্যারান্টি দেয়, তাহলে ওরা পাঁচ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট দেবে।’’

‘‘গ্যারান্টর মানে তো আপনি যদি টাকা ঠিকমত না দেন, তো আমায় দিতে হবে।’’

‘‘হ্যাঁ, সেই প্রমিস করে তোমাকে একটা নোটে সই করতে হবে।’’

‘‘কত টাকার ব্যাপার, প্রকাশদা।’’

‘‘পঁচিশের নীচেই হবে। হাজার পাঁচেক আমি ডাউন পেমেন্ট করব, আর বাকিটা লোন।’’

‘‘ও, সে তো অনেকগুলো টাকা। অতগুলো টাকার দায়িত্ব নেওয়া, এই সময়ে। আমাদের আবার দেশে যাওয়ার প্ল্যান আছে। সামনে বড় খরচের ধাক্কা। আমি একটু শর্মিষ্ঠার সঙ্গে কথা বলে দেখি। কয়েকটা দিনের মধ্যেই আপনাকে জানাচ্ছি।’’

দিন তিনেক বাদে সবিতা সন্ধ্যাবেলা সুপ্রকাশের পড়ার ঘরে ঢুকে বলল, ‘‘তুমি প্রদ্যোতের কাছে টাকা ধার চেয়েছ?’’

‘‘না তো।’’

‘‘এই তো শীলা টেলিফোন করেছিল, বলল আমাকে। তুমি নাকি প্রদ্যোতের কাছ থেকে কুড়ি হাজার টাকা ধার চেয়েছ। এই নিয়ে লোকে এখন বলাবলি করছে, ‘বলে বেড়ায়, এত বড় চাকরী নাকি করে। এদিকে টাকার জন্যে লোকের কাছে হাত পেতে বেড়ায়।’ তোমার এত টাকার কি দরকার হল এখন?’’

‘‘আমি প্রদ্যোতের কাছ থেকে টাকা ধার চাই নি। আমি গাড়ির জন্য ওকে গ্যারান্টর হতে রিকোয়েস্ট করেছিলাম। তোমাকে তো সব কথা বলেইছি। সেটা আর টাকা ধার এক হল? টাকা তো আমি প্রত্যেক মাসে ঠিক মত দিয়ে দেব। ওর কাছ থেকে টাকা নেবার দরকার হবে কেন? কার কাছ থেকে শীলা এসব কথা শুনেছে?’’

‘‘আমি জানি না, আমাকে বলে নি। এসব কথায় কেউ কারোর নাম বলে না।’’

‘‘আমার কথা বিশ্বাস না হয়, প্রদ্যোতকে ফোন করে দেখ।’’

‘‘থাক, ওকে ফোন করে কি করব? অনেক নিজের মাথা নীচু করেছ। একটু বুঝে শুনে কাজ কোর। তোমার জন্য যে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যায় লোকের কাছে।’’

BEST WISHES

TO

ALL CUAA-DC MEMBERS

FROM

DEBKUMAR AND PRAMITA CHATTERJEE

Best Wishes

From

Hindola, Sarbari and Gora Gangopadhyay

Best Wishes

From

Braja, Parna, Romita and Ronit Chattaraj

Best wishes
to all Calcutta University Alumni

From
Guha Family
Udayan, Romi, Deyaan & Mahilan

Best wishes
to all Calcutta University Alumni

From
Paria Family
Biman, Ananya, Swarnarupa and Anubhuti

কলিকাতা বিশ্ববিদ্বালয়ের প্রাক্তন সদস্যদের
জানাই আমাদের
আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

সুমন, মহুয়া ও রাজিত মুখোপাধ্যায়

May Goodwill and

Prosperity Prevail

From Chatterjee Family

Disha, Saborni,
Sreejato & Digonto

Best wishes
to all Calcutta University
Alumni

From
Biswas Family
Roopa, Dhruba, Deep and Diya

আন্তরিক প্রীতি
ও শুভেচ্ছা জানাই

তারক, শিখা
ও রূপম ভড়

যাঁদের শিক্ষা ও সস্নেহ পথ নির্দেশনায়

আমাদের জীবন গড়ে উঠেছে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

সেই বরেণ্য শিক্ষকদের

প্রণাম জানাই

মনীষা ও লোকেশ

MATHNASIUM
The Math Learning Center
CATCH UP, KEEP UP, or GET AHEAD
in Math this school year!
At Mathnasium, we help kids in grades 2–12 reach their potential in math by teaching in a way that makes sense to them. Kids leap way ahead—whether they started out far behind or already ahead in math. When math makes sense, you succeed.
CALL OR VISIT TODAY!
$50 OFF Assessment
We Make Math Make Sense
Mathnasium of Ellicott City
3290 Pine Orchard Lane #B
Ellicott City, MD 21042
443-863-MATH (6284)
mathnasium.com/ellicottcity
Mathnasium of Germantown
18072 Mateny Road
Germantown, MD 20874
301-363-4744
mathnasium.com/germantownmd
Mathnasium of Rockville
20 Courthouse Square #106
Rockville, MD 20850
301-768-4255
mathnasium.com/rockville
Potomac Location
COMING SOON!
877-YOU-MATH, ext. 14

With Complements from

The Motayed Family